বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী গ্রন্থমালা

তৃতীয় স্তবক

উপনিষৎ-সঙ্কলন

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
বেলঘরিয়া

বিবেকানন্দ-শতাব্দী-জয়ন্তী গ্রন্থমালা

তৃতীয় স্তবক
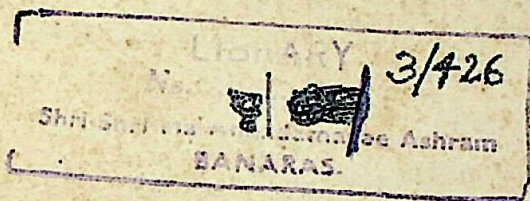
উপনিষৎ-সঙ্কলন

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা ২৪ পরগনা

প্রকাশক
স্বামী সন্তোষানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা ২৪ পরগনা

প্রথম প্রকাশ :
স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মতিথি
৩রা মাঘ ১৩৬৯ : ১৭ই জানুআরী ১৯৬৩

দাম এক টাকা

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় বিবেকানন্দ-শতাব্দী-জয়ন্তী গ্রন্থমালার তৃতীয় স্তবক প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে উপনিষদ্ হইতে সঙ্কলিত মন্ত্রের সহিত সংযোজিত হইয়াছে বেদমূর্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, 'তাঁহার (রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের) জীবন একটি অমিততেজসম্পন্ন সন্ধানী আলোর ন্যায়—যাহার সহায়ে বেদের যথার্থ মর্ম লোকসমাজে প্রকটিত হইয়াছে।' স্বামীজীর এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বর্তমান যুগে পরমহংসদেবের জীবনী-সহায়েই সর্বসাধারণের পক্ষে উপনিষদের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব। এইজন্যই এই গ্রন্থে পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইল।

পরমহংসদেবের জীবনী লিখিয়াছেন বেলুড় বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ। উপনিষদের মন্ত্র সংগ্রহ এবং শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিধুভূষণ তর্কবেদান্ততীর্থ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্য মন্ত্রগুলির সঙ্গে তাহাদের সরলার্থ দেওয়া হইল। এই সরলার্থ লেখা হইয়াছে স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত "উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী" অবলম্বনে। মন্ত্রগুলির সরলার্থ পড়িয়া যাঁহারা আরও বিশদভাবে উহা পাঠে আগ্রহান্বিত হইবেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য প্রতি মন্ত্রের নীচে উপনিষদের নাম ও মন্ত্রের পরিচায়ক সংখ্যা দেওয়া হইল।

প্রধানতঃ যাঁহার অর্থানুকূল্যে এই "জয়ন্তী" গ্রন্থমালা প্রকাশ করা

সম্ভব হইল তাঁহার বিশেষ আপত্তি থাকায় নাম প্রকাশ করা হইল না। গ্রন্থখানির যাহাতে বহুল প্রচার হয় সেইজন্য ইহার মূল্য খুবই অল্প করিয়া ধার্য করা হইল।

যে সকল সহৃদয় ব্যক্তির অকুণ্ঠ সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইল, শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রার্থনা করি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

"যত মত তত পথ।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রস্তাবনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

৪।৭-৮

—'হে ভারত, যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনি আমি (মায়াবলে) আত্মদেহের সৃষ্টি করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকি।' বলা বাহুল্য, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এইরূপই এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্যের আপাতরমণীয় বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা ও ভোগবাদকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে ছুটিতেছিল। ভারতের ধর্ম, কৃষ্টি ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিপুল আলোড়ন ভারত-ভারতীকে দিনের পর দিন আত্মবিস্মৃত, পরমুখাপেক্ষী, পরানুকরণপ্রিয় এবং জড়বাদী করিয়া তুলিতেছিল। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে, যুগ-প্রয়োজন সাধনকল্পে শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুণ্যভূমি এই ভারতকে আর একবার ধন্য করেন।

পল্লী-বাংলার হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে উনবিংশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যার সহায়ে সর্বধর্ম ও সর্বশাস্ত্রের মর্ম নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া অভিনব অত্যুদার আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাধুর্য-মণ্ডিত জীবনের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি, অমৃতোপম লীলা-কাহিনী এবং সর্বজনীন উপদেশনিচয় বিশ্ববাসীকে আস্তিক্যবুদ্ধি দান করিয়াছে। পথভ্রান্তকে প্রকৃত কল্যাণপথের সন্ধান দিয়াছে এবং তৃষিত মানব-প্রাণে অনন্ত তৃপ্তি ও মধুময় শান্তির অমৃতবারি আজও সিঞ্চন করিতেছে। তাই মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত ধর্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধির একটি প্রকৃষ্ট ইতিহাস। তাঁহার জীবন আমাদিগকে ভগবানের সাক্ষাৎকার করিতে সহায়তা করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্ত বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,—যাহা সহস্র সহস্র নরনারীকে আজ পরমশান্তি ও সান্ত্বনা দিতেছে।

দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে লক্ষ্য করিয়া ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন—"ত্রিশ কোটি মানবের দ্বি-সহস্রবৎসরব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতি-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন সহস্র সুরের একটি সমন্বিত ঐকতান, যেখানে মানবজাতির সহস্র ধর্ম ও সহস্র মতবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।" বর্তমান পুস্তিকায় ভারত-কৃষ্টির মূর্ত বিগ্রহ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের এই সর্বজনীন জীবনবেদকেই সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করিতে আমরা প্রয়াসী হইয়াছি।

পিতৃপরিচয় ও জন্মকথা

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর আজ এক পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অগণিত ভক্ত-সমাগমে ও তাঁহাদের কণ্ঠোচ্চারিত নামগুণগানে শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীখানি আজ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কামারপুকুর আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গৌরবময় ঐতিহ্যের চিহ্ন আজও নানা স্থানে নানা আকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত দেরে গ্রামে মানিকরাম চট্টোপাধ্যায় নামক মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইংরাজী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষুদিরাম এবং তৎপর তাঁহার রামশীলা নাম্নী এক কন্যা ও নিধিরাম এবং কানাইরাম নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। মানিকরামের তিরোধান ঘটিলে সংসারের সমগ্র দায়িত্ব জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষুদিরামের স্কন্ধেই ন্যস্ত হয়। তিনি ও তাঁহার সহধর্মিণী চন্দ্রমণি দেবী গৃহদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া অতি নিষ্ঠার সহিত সংসারের সকল কার্য নির্বাহ করিতে থাকেন। এই ব্রাহ্মণ-দম্পতির উন্নত চরিত্র, দেবানুরাগ, দয়াদাক্ষিণ্য এবং নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা দর্শনে জাতিধর্মনির্বিশেষে গ্রামবাসিগণ তাঁহাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

ধর্মপ্রাণ ক্ষুদিরামকে অচিরে এক অপ্রত্যাশিত পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইল। গ্রামের প্রজাপীড়ক জমিদার রামানন্দ রায় জনৈক প্রজার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া ক্ষুদিরামকে স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ক্ষুদিরাম চিরদিনই সত্যনিষ্ঠ ও ভগবানে নির্ভরশীল—তাঁহার অন্তরচেতনা এই প্রস্তাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি সাক্ষ্য দিতে সম্মত না হওয়ায় কূটচক্রী রামানন্দ রায়

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা মামলা করিয়া তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে ব্যথিত হইলেও ক্ষুদিরাম হতাশ হইলেন না। তিনি গৃহদেবতা রঘুবীরের উপর একান্ত নির্ভরশীল থাকিয়া তাঁহারই নির্দেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ভক্তবৎসল ভগবানও এই ঘনায়মান অন্ধকারে ক্ষুদিরামকে কল্যাণপথ দেখাইলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু কামারপুকুর নিবাসী শ্রীসুখলাল গোস্বামী তাঁহাকে কামারপুকুরে চলিয়া আসিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইলেন। তখন ১৮১৪ সাল। বন্ধুবরের এই অযাচিত আহ্বানকে রঘুবীরেরই আদেশ জ্ঞান করিয়া ক্ষুদিরাম পরমপ্রিয় পৈতৃক ভিটা তথা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পুত্র রামকুমার ও কন্যা কাত্যায়নী সহ সস্ত্রীক ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে কামারপুকুরে চলিয়া আসিলেন। কামারপুকুরে আসিয়া তিনি বন্ধুপ্রদত্ত কয়েক-খানি চালাঘর ও লক্ষ্মীজলা নামক এক বিঘা দশ ছটাক ধান্যজমি অবলম্বনে নূতনভাবে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিলেন। এই বিপদ হইতে এইভাবে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন যে, তাঁহার কুলদেবতা রঘুবীরের প্রসাদেই এইপ্রকার অঘটন সংঘটিত হইয়াছে।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা তাঁহার বিশ্বাসকে আরও গভীর ও দৃঢ় করিয়া তুলিল। একদিন কার্যোপলক্ষে গ্রামান্তর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ক্ষুদিরাম ক্লান্তদেহে জনহীন প্রান্তরে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। স্নিগ্ধ সমীরণ-স্পর্শে নিদ্রাভিভূত হইয়া তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহারই আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্র বালক-বেশে তাঁহাকে স্থানবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "আমি এইখানে

অনেক দিন অনাহারে অযত্নে আছি, আমাকে তোমার বাড়িতে লইয়া চল, তোমার সেবা গ্রহণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।” নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুদিরাম নির্দিষ্টস্থানে দ্রুতপদে গমন করিয়া ভুজঙ্গ-ফণাচ্ছাদিত সর্বসুলক্ষণ এক শালগ্রামশিলা দর্শনে “জয় রঘুবীর” বলিয়া সোল্লাসে উহা গ্রহণ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় বিষধর সর্পটি ক্ষুদিরামকে দেখিয়া ইতিপূর্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। আনন্দবিহ্বল ক্ষুদিরাম সত্বর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং অভীষ্ট দেবী শীতলার পার্শ্বে এই রঘুবীরশিলাকে গৃহদেবতারূপে যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠাপূর্বক ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উহার নিত্যপূজা করিতে লাগিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই ঋষিতুল্য ক্ষুদিরাম ও সরলতার প্রতিমূর্তি চন্দ্রাদেবী তাঁহাদের অন্তরের ঔদার্য, প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসায় গ্রামবাসিগণের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। ক্ষুদিরাম অর্থশালী না হইলেও দানে মুক্তহস্ত ছিলেন, শ্রান্ত পথিক ও ভিখারী এবং দীন-দরিদ্রের জন্য তাঁহার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত।

এইভাবে কামারপুকুরে ক্ষুদিরামের ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। দেরে গ্রামে অবস্থানকালেই তাঁহার সহোদরা রামশীলা দেবী ছিলিমপুরে ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রামচাঁদ নামক এক পুত্র এবং হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কন্যাস্বরূপিণী হেমাঙ্গিনীকে ক্ষুদিরাম স্বয়ং সিহড় নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী পরবর্তীকালে রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম নামে চারি পুত্রের জননী হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ষোড়শ বৎসর বয়স্ক রামকুমার

নিকটবর্তী গ্রামের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া উপার্জনক্ষম হইয়া উঠিলেন এবং পিতার সংসার-যাত্রা নির্বাহার্থে নানাপ্রকার সাহায্য করিতে লাগিলেন। ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অচিরে সে সমস্যারও সমাধান হইয়া গেল। তৎকালীন প্রথানুযায়ী তিনি আন্থড় গ্রামের শ্রীযুক্ত কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিয়া কেনারামের ভগিনীর সহিত নিজ পুত্র রামকুমারের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে পারিবারিক কার্যের কতকটা সুব্যবস্থা হওয়ায় রামকুমারের উপর সংসারের সমগ্র ভার অর্পণ করিয়া তিনি ১৮২৪ সালে পদব্রজে তীর্থযাত্রা করিলেন।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সেতুবন্ধ, রামেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পুনঃ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রামেশ্বর-তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় বলিয়া এই পুত্রের নাম রাখা হইল রামেশ্বর।

রামকুমার স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান দিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম করিয়া যাহা উপার্জন করিতেন, তাহা দ্বারা ক্ষুদিরামের ধর্মের সংসারে অভাবজনিত কষ্টের অনেকখানি লাঘব হইয়াছিল। এখন সংসার-চিন্তা হইতে অনেকটা মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ভগবৎধ্যান, পূজা ও শাস্ত্রপাঠে আরও অধিক সময় অতিবাহিত করার সুযোগ পাইলেন। তাঁহার বয়স এখন ষষ্টি বর্ষ। তথাপি পদব্রজে গয়াধামে যাইবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহার মনে উদয় হইল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া প্রথমে মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীধামে বিশ্বনাথকে দর্শন, স্পর্শন ও পূজাদি করিলেন;

তৎপর গয়াধামে গমন করিয়া পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলেন। জীবনের শেষ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া তিনি আজ নিশ্চিন্ত। শ্রীভগবানও ক্ষুদিরামের শ্রদ্ধাপূত অর্ঘ গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। গভীর রাত্রে ক্ষুদিরাম স্বপ্নে দেখিলেন,—উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত শ্রীমন্দিরের দিব্য সিংহাসনে শ্রীভগবান জ্যোতির্ময় দেহে সমাসীন। উপাসনারত পিতৃপুরুষগণ করজোড়ে সেই পরমপুরুষের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সহসা সেই পরমপুরুষ ক্ষুদিরামের প্রতি স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি; পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।" সহসা জাগ্রত হইয়া স্তম্ভিত পুলকিত ক্ষুদিরাম এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া নিরতিশয় আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, এই নগণ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে ত্রিদিবাধিপতি শ্রীভগবান পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া নরলীলা করিবেন আর জগৎবাসী সেই দিব্যলীলাভিনয় দর্শনে ধন্য, কৃতার্থ হইবে—ইহাও কি সম্ভব!

গয়াধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধর্মপ্রাণা সহধর্মিণীর নিকট ক্ষুদিরাম শুনিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে একদিন গ্রামের কামারকন্যা ধনীর সহিত তিনি পার্শ্ববর্তী যুগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন কথা কহিতেছিলেন তখন সহসা এক অপার্থিব জ্যোতি দেবাদিদেব মহাদেবের অঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া তরঙ্গাকারে তাঁহার উদরে বেগে প্রবেশ করে এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। তদবধি চন্দ্রাদেবী যেন অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতেছেন। সেই

সময় হইতে প্রতিনিয়ত নানারূপ অলৌকিক দিব্যদর্শন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কখনও বিস্মিত, কখনও পুলকিত ও আনন্দবিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। এই সমস্ত শুনিয়া গয়াধামের স্বপ্নদৃষ্ট পরমপুরুষের সেই বাণীসকল যে সফল হইতে চলিয়াছে তাহাতে ক্ষুদিরামের আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না। ভক্তিমান শ্রীক্ষুদিরাম ও পূতচরিত্রা চন্দ্রাদেবী আরাধ্য দেবতা শ্রীরঘুবীরের শরণাগত হইয়া আকুল আগ্রহে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের পুণ্যদিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতিদেবী দিব্যশ্রী ধারণ করিয়াছেন। দিকে দিকে আনন্দের হিল্লোল ছুটিয়াছে। বিটপি-বল্লরী-বহুল পল্লীদেবীর এই নিভৃত শান্তিনিকেতন পিককণ্ঠের মধুর কাকলীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিকচকুসুম ও চূতমুকুলের স্নিগ্ধ গন্ধে পল্লীভবন আজ আমোদিত—যেন স্থাবর জঙ্গম কোন আকাঙ্ক্ষিতের আগমন প্রতীক্ষায় স্পন্দিত ও উল্লসিত। ক্রমে শুভ ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি উপস্থিত হইল। আজ ১২৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুআরি। নিশা অবসান হইতে প্রায় অর্ধদণ্ড অবশিষ্ট, এমন সময় চন্দ্রাদেবীর প্রসবপীড়া উপস্থিত হইল। কামারকন্যা ধনীর সাহায্যে তিনি ঢেঁকিশালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রেমঘনমূর্তি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বহৃদয় নন্দিত করিয়া যুগকল্যাণকল্পে পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্তে ক্ষুদিরাম-গৃহে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি ক্ষুদিরামের দরিদ্রভবনকে মুখরিত করিয়া দেবশিশুর জন্মবার্তা ঘোষণা করিল।

আশ্চর্যের বিষয়, ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতে নবজাতক ভস্মপূর্ণ চুল্লীর মধ্যে পড়িয়া বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া নিঃশব্দে অবস্থান করিতেছিল। প্রিয়দর্শন বালককে সযত্নে চুল্লী হইতে উঠাইয়া ধনী

সর্বাঙ্গ পরিষ্কৃত করিলেন। যিনি উত্তরকালে ত্যাগের চরম আদর্শ স্থাপন করিয়া জগদ্‌বরেণ্য হইবেন, তিনি যেন জীবনপ্রভাতেই সংসারের অসারত্বসূচক বিভূতি স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। জ্যোতির্বিদ্‌গণ জাতকের জন্মলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ক্ষুদিরামকে জানাইলেন যে, এই শিশু উত্তরকালে নবীন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া নারায়ণবংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। গয়াধামের স্বপ্ন আজ পূর্ণ হইল ভাবিয়া ক্ষুদিরামের আনন্দের সীমা রহিল না। জাতকর্মাদি সমাপনান্তে শিশুর রাশ্যাশ্রিত নাম স্থির হইল শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র ; কিন্তু গয়াধামের সেই দিব্যস্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষুদিরাম তাহাকে গদাধর নামে অভিহিত করিতেই মনস্থ করিলেন।

বাল্য ও কৈশোরলীলা

শিশু শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্ধিত হইয়া জনক-জননী ও পল্লীবাসী সকলের উপর অচিরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। চঞ্চল বালকের চম্পকস্নিগ্ধ দিব্য অঙ্গকান্তি ও তাহার সু-উজ্জ্বল মুখ-কমলের মধুর হাসি দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটিবার নিরীক্ষণ করিতে না পারিলে পল্লীর মহিলারা আকুল হইয়া উঠিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের বিচিত্র চপল আচরণসমূহ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

বালককে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য ক্ষুদিরাম তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অনুরক্ত না হইয়া খেলাধুলায় রত থাকিত। তাহার অনন্যসাধারণ

প্রতিভা কিন্তু অন্যদিকে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। বালক শ্রুতিধরত্বগুণে অত্যল্পকালের মধ্যে দেবদেবীর স্তোত্র, পুরাণকাহিনী এবং রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে বিচিত্র উপাখ্যানাদি শ্রবণমাত্রই আয়ত্ত করিয়া ফেলিত। ঈশ্বরীয় কথায় উল্লাস, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় অসাধারণ প্রতিভা, যাত্রাভিনয় দর্শনান্তে তাহার সঠিক অনুকরণ-দক্ষতা ও ভগবৎলীলাকীর্তনে গভীর ভাবতন্ময়তা, তাহার অতুলনীয় নৃত্য ও মনোহর ভাবভঙ্গী দেখিয়া পল্লীবাসিগণ এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে ডুবিয়া যাইত। বৈচিত্র্যবিরল পল্লীজীবনে এই দৃশ্যকাব্যের অভিনয় যে কত মধুর, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বালক সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই অল্প বয়সেই তাহার ভাবতন্ময়তা এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, প্রকৃতির কোন রমণীয় দৃশ্য দেখিবামাত্র তাহার শুচিশুভ্র মন সসীম হইতে অসীমে লীন হইয়া যাইত। একদিন সঙ্গিগণ সহ প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ-কালে নবজলধরক্রোড়ে শ্বেত বলাকাশ্রেণীর স্বচ্ছন্দ বিহার দর্শনে তাহার ভাবপ্রবণ চিত্ত অনন্ত ভাব-রাজ্যে ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যসংজ্ঞাহীন দেহ ভূতলে লুটাইল। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে একদিন পল্লীবাসিনীগণ সহ পার্শ্ববর্তী আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষী দেবী দর্শনে যাইবার কালে সুধাকণ্ঠে বালক গান গাহিতে গাহিতে ভাবের আতিশয্যে পথিমধ্যে এইরূপ বাহ্যচেতনাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও একটি ঘটনা বাল্যকালে গদাধরের উচ্চভাবভূমিতে আরূঢ় হইবার সাক্ষ্য প্রদান করে। গ্রামে শিবমহিমাসূচক যাত্রাভিনয় হইবে। যিনি শিবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় গদাধরকেই শিব-সাজে সজ্জিত করিয়া যাত্রার

আসরে আনয়ন করা হইল। গদাধরের জটাজটিল বিভূতি-মণ্ডিত তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, ধীর ললিত পদক্ষেপ, অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি দেখিয়া নির্বাক জনমণ্ডলী আনন্দ ও বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উঠিল। এদিকে শিবচিন্তায় বিভোর গদাধর বাহ্যজ্ঞানবিরহিত অবস্থায় ধ্যানস্তিমিত নেত্রে একইভাবে দণ্ডায়মান—কোন সাড়াশব্দ নাই। সে রাত্রে বালকের সেই ভাবসমাধি বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হইল না। পরবর্তীকালে যিনি নিমেষে অত্যুচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিতেন, বাল্যকালের এই ভাবতন্ময়তা যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দিব্য-ভাবেরই দ্যোতক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

আমরা ইতিপূর্বে ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্ষুদিরামের রামশীলা নাম্নী ভগিনীর বিবাহের উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার পুত্র রামচাঁদ অধিকাংশ সময়ে কর্মব্যপদেশে মেদিনীপুরে অবস্থান করিলেও প্রতিবৎসর পৈতৃক বাসভূমি ছিলিমপুর গ্রামে মহা সমারোহের সহিত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করিতেন। ইংরাজী ১৮৫৩ সাল—শারদীয়া পূজা সমাগত। ভাগিনেয় রামচাঁদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও ক্ষুদিরাম ছিলিমপুরে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পরই হঠাৎ গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া রঘুবীরের নামোচ্চারণপূর্বক বিজয়া-দশমীর দিন সেই বাটীতেই দেহত্যাগ করিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্ষুদিরামের পরিবারস্থ সকলে বিশেষ শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া গদাধরও নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেবল এক উন্মনা ভাব আসিয়া তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল। দৈবশক্তিসম্পন্ন বালকের পক্ষে এই বয়সেই সংসারের অনিত্যতা

উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। এখন হইতেই সে চিন্তাশীল ও নির্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠিল। কখনও গ্রামের পশ্চিম-উত্তরভাগে ভূতির খালের শ্মশানে, কখনও মানিকরাজার আম্র-কাননে কোন জনশূন্য স্থানে একাকী উদ্‌ভ্রান্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল। আবার কখনও গ্রামের অগ্নিকোণে পুরীধামে যাইবার পথিপার্শ্বে অবস্থিত পান্থনিবাসে ধুনি-পার্শ্বে সমাসীন জটাজূটধারী দিগম্বর নাগা সন্ন্যাসিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের সেবার্থে নানাভাবে সহায়তা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। সাধু-সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে গদাধরের অশেষ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া জননী চন্দ্রমণি তাহার এই সাধুসঙ্গ প্রসন্ন দৃষ্টিতেই দেখিতেছিলেন। কিন্তু যেদিন চাঁচর-কুন্তলদামপরিবৃত ললাটফলকে শিশু শশধরসদৃশ সমুজ্জ্বল তিলকরাগ ধারণ করিয়া "মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন দেখ" বলিয়া কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া গদাধর স্নেহময়ী জননীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, সে-দিন এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় চন্দ্রাদেবীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বুঝি সন্ন্যাসীরা গদাধরকে ভুলাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে—এই চিন্তায় অবিরল অশ্রুধারে মাতার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমান বালকের ইহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হইল না। মায়ের উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য সে পান্থশালায় গমনাগমন বন্ধ করিল। এদিকে সন্ন্যাসিগণ সুদর্শন বালককে কিছুদিন না দেখিতে পাইয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহে আগমন করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন, এবং মাতাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, বালককে সঙ্গে লইয়া যাইবার কোন অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। মাতাও সাধুগণের কথায় আশ্বস্ত হইয়া বালককে পূর্বের ন্যায় সাধুদের সঙ্গে মিশিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

বালক গদাধর নবম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। উপযুক্ত সময় আগত দেখিয়া রামকুমার তাহার উপনয়নের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কুলপ্রথানুযায়ী উপনয়নান্তে স্বীয় জননীর হস্তেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করা বিধেয়। কিন্তু কামারকন্যা ধনীর অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার অভিলাষ পূরণার্থ গদাধর অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, সে উপনয়নকালে তাহাকেই ভিক্ষামাতা করিবে অর্থাৎ তাহার নিকট হইতেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। সময় উপস্থিত দেখিয়া এখন সে এই বিষয়ে জ্যেষ্ঠের অনুমতি চাহিয়া বসিল। বালকের এই প্রস্তাবে স্তম্ভিত রামকুমার ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেও সত্যনিষ্ঠ বালক গদাধর তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য জেদ ধরিল। অবশেষে নিঃস্বার্থ প্রেম ও সত্যেরই জয় হইল। পিতৃসুহৃদ শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রামকুমার বালকের অভিলাষ পূরণ করিলেন।

এই সময়ের আরও দুই একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। জমিদার লাহাবাবুদের বাটীতে কোন অনুষ্ঠানোপলক্ষে এক পণ্ডিতসভা আহূত হয়। সেখানে উপস্থিত পণ্ডিতগণ ধর্মসম্বন্ধীয় কোন এক জটিল প্রশ্নের সুমীমাংসায় উপনীত হইতে সক্ষম না হওয়ায় শ্রোতৃমণ্ডলী হইতে বালক গদাধর জনৈক পরিচিত পণ্ডিতকে প্রশ্নের মীমাংসাসূচক এক সিদ্ধান্ত বলিয়া দিল। বালকের মীমাংসা যথাযথ হইয়াছে বুঝিয়া পণ্ডিতগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকলে গদাধরের বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বালকের লাবণ্যময় বিনোদ গঠন, স্বচ্ছ সরলতা, সর্বোপরি তাহার দুর্জয় আকর্ষণী শক্তি তাহাকে অনেকের হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে দেবতার আসনে বসাইয়াছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শ্রীনিবাস শাঁখারী গদাধরকে স্নেহ

ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এক দিবস শ্রীনিবাস আপন মনে দেবতার উদ্দেশ্যে মালা গাঁথিতেছে ; হঠাৎ গদাধর তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীনিবাস তাহার দর্শনমাত্র এক অজ্ঞাত প্রেরণায় নিকটস্থ দোকান হইতে ফলমিষ্টি ক্রয় করিয়া আনিল এবং প্রেমভরে প্রাণের সাধ মিটাইয়া বালককে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে ফলমিষ্টান্নাদি খাওয়াইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বাবা গদাই, আমি ভজনহীন, অতিদীনহীন কাঙাল। এই সংসার হইতে চলিয়া যাইবারও দিন অতি সন্নিকট। তুমি জগতের হিতের জন্য ভবিষ্যতে কত কি কার্য করিবে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইবে না। বাবা, তোমার কাছে এ দীনের এই মিনতি—তুমি এই দীন কাঙালকে কখনও ভুলিও না।" ধন্য শ্রীনিবাস! মুনিঋষিগণ কোটি-কল্পের সাধনায় যাঁহার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হয় না, তুমি তোমার অকৃত্রিম শুদ্ধ প্রেমের বলে নররূপধারী সেই শ্রীভগবানের প্রকৃতস্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার পবিত্র দর্শন-স্পর্শনে আজ ধন্য হইলে।

গদাধর ক্রমে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর ও কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা উভয়েই বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হওয়ায় রামকুমার কামারপুকুরের নিকটবর্তী গৌরহাটি গ্রামে তাহাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন।

রামকুমারের পারিবারিক জীবনে এই সময় এক বিপর্যয় ঘটিল। তাঁহার সহধর্মিণী এক পরম রূপবান পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া সূতিকা-গৃহেই ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে এখন হইতে রামকুমারের উপার্জন কমিয়া যাইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া

অর্থান্বেষণে তিনি কলিকাতায় গিয়া ঝামাপুকুর লেনে একটি টোল খুলিয়া অধ্যাপনা এবং যাজনিক বৃত্তিদ্বারা অর্থাগমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অপরূপ রূপলাবণ্য ও অশেষ গুণের আকর গদাধর যে গ্রামবাসী সকলেরই আনন্দের উৎসস্বরূপ ছিল সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ও রঙ্গরসপ্রিয়তাসূচক একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। গ্রামের দুর্গাদাস পাইন অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের সহিত পুরুষদিগের স্বচ্ছন্দ মেলামেশা মোটেই সুনজরে দেখিতেন না এবং তাঁহার পরিবারস্থ কঠোর অবরোধপ্রথা তাঁহার অত্যন্ত অহঙ্কারের বিষয় ছিল। গদাধরের নিকটও তাহা অবিদিত ছিল না। দুর্গাদাস স্পর্ধাভরে গদাধরকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্দরমহল এমন সুরক্ষিত যে অপরের পক্ষে সেখানে প্রবেশ লাভ করা বা পারিবারিক জীবনের কথা অবগত হওয়া একান্ত অসম্ভব। দর্পীর দর্প চূর্ণ করিবার মানসে গদাধর একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তন্তুবায় রমণীর সাজে সজ্জিত হইয়া হাটের দিক হইতে দুর্গাদাসের গৃহের সম্মুখে আসিয়া রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিল। রমণীকে বিপন্না মনে করিয়া দুর্গাদাস তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। গদাধর অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক রমণীর আচরণ, গতিবিধি, ভাবভঙ্গী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হওয়ায় রামেশ্বর গদাধরকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দুর্গাদাসের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গদাধরের নাম ধরিয়া ডাকিতেই গদাধর গৃহাভ্যন্তর হইতে উচ্চকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। দুর্গাদাসের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। দুর্গাদাস প্রথমে কথঞ্চিৎ রুষ্ট হইলেও এখন হইতে

অন্তঃপুরচারিণীদিগকে গদাধরের সান্নিধ্যে বসিয়া তাহার পাঠকীর্তনাদি শ্রবণ করিতে আর বাধা প্রদান করিতেন না।

গদাধর চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার বৈরাগ্য-প্রবণ মন কখনও কখনও কল্পনার ডানা মেলিয়া বাস্তব জগতের বহু ঊর্ধ্বে উধাও হইয়া যাইত। কখনও গিরিদরীমধ্যে যোগাসনে সমাসীন ধ্যানমগ্ন যোগীর ভাবগম্ভীর মূর্তি, কখনও স্বচ্ছন্দবিচরণশীল গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীর জ্ঞানদীপ্ত দিব্যকান্তি, আবার কখনও ভাববিহ্বল প্রেমিক ভক্তের অনাবিল আনন্দোচ্ছ্বাস তাহার শুভ্র অপাপবিদ্ধ মানসপটে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিত এবং তাহার প্রাণে অনন্তের আহ্বান অহর্নিশ অনুরণিত হইত। ক্রমে অর্থকরী বিদ্যার প্রতিও তাহার বিষয়বিমুখ মন আরও উদাসীন হইয়া উঠিল। এখন হইতে গয়াবিষ্ণু প্রমুখ বাল্য সহচরবৃন্দের সঙ্গে ক্রীড়ার ছলে জনবিরল মানিকরাজার আম্রকাননে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক লীলাভিনয়ে তাহার অধিকাংশ সময় কাটিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, পল্লীবাসিনীগণের অনুরোধে গ্রামাভ্যন্তরেও কখনও কখনও নটনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। বালক গদাধর যখন চাঁচরচিকুরশোভিত শিরে শিখিপাখা এবং পরিধানে পীতাম্বর ধারণ করিয়া ললিতত্রিভঙ্গঠামে মুরলী হস্তে অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসি হাসিয়া বৃন্দাবন-লীলা অভিনয় আরম্ভ করিত, তখন মুগ্ধনেত্রে সে রূপমাধুরী পান করিয়া সকলেই আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইত। এই চিত্তমনোহারী অভিনয় দর্শনে ক্ষণিকের জন্য তাহাদের মন এই সুখদুঃখ, হাসিকান্নার রাজ্য ছাড়িয়া মধুময় বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে বিহার করিত। বলা বাহুল্য, এইভাবে সংকীর্তন ও যাত্রাভিনয়ে মত্ত হইয়া তাহার পাঠশালায় যাওয়া ও অধ্যয়ন করা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

রামকুমার অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা ঝামাপুকুর লেনে চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন। সেখান হইতে মধ্যে মধ্যে স্বগ্রামে আসিয়া কনিষ্ঠের বিদ্যাভ্যাসে ঘোরতর উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। টোলের ছাত্রসংখ্যা ও গৃহকার্য বর্ধিত হওয়ায় তাঁহার একার পক্ষে সকল কার্য সুসম্পন্ন করাও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল। তাই গদাধরকে কলিকাতায় নিজের কাছে রাখিলে তাহার শিক্ষাদির সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং সেও পূজা এবং গৃহকার্যে তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতে পারিবে মনে করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। গদাধরও সানন্দে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল। সপ্তদশবর্ষীয় কিশোর গদাধর শুভক্ষণে শুভদিনে স্নেহময়ী মাতার চরণ বন্দনা করিয়া ও রঘুবীরের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া অগ্রজের সঙ্গে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরই এখন হইতে কামারপুকুরে অবস্থান করিয়া সংসারের কাজকর্ম ও প্রৌঢ়া জননীর সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী-মন্দিরে

বিধাতার বিচিত্র বিধানে গদাধরের কর্ম ও লীলাক্ষেত্র পল্লীর শান্ত পরিবেশ হইতে কর্মমুখর জনবহুল কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। এই পটপরিবর্তনের পশ্চাতে শ্রীভগবানের কি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে স্থূলবুদ্ধি মানব তাহা বুঝিতে না পারিলেও উহার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইতে বিলম্ব হইল না। অশেষগুণসম্পন্ন বালক কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে নিত্য দেবসেবার ভারপ্রাপ্ত হইয়া

অবসরমত অগ্রজের নিকট পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু এখানেও গদাধর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিঃসঙ্কোচে মিলিত হইয়া ও তাহাদিগকে পুরাণকথা ও ভজন শুনাইয়া অচিরে সকলের অতীব প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে পূর্বের ন্যায় বিদ্যা-শিক্ষায় উদাসীন হইয়া পড়িলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্যার্জনে এই ঔদাসীন্য দেখিয়া একদিন রামকুমার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে গদাধর দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাই না, আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাই যাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।" এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে রামকুমার বিস্মিত হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুবীরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নীরবে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং ভগ্নহৃদয়ে সুদিনের প্রতীক্ষায় থাকিলেন।

প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়া রামকুমার যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন ঠিক সেই সময়ে অভাবনীয় এক উপায়ে সুদূরপ্রসারী কল্যাণপথ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বালক গদাধরেরও আধ্যাত্মিক জীবনের চরম বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হইল।

তৎকালে কলিকাতার জানবাজার পল্লীতে অশেষগুণশালিনী মাহিষ্য-কুলসম্ভূতা রানী রাসমণি বাস করিতেন। তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, বুদ্ধিমত্তা, তেজ ও শৌর্য প্রভৃতির কথা বাংলা দেশের সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়া তাঁহাকে সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী করিয়া তুলিয়াছিল। ভক্তিমতী রানী ১৮৪৭ সালে পূতসলিলা সুরধুনীর পূর্ব উপকূলে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থব্যয়ে সেখানে শ্রীশ্রীভবতারিণী ও রাধাগোবিন্দজীর

মন্দির এবং দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বাদশ মন্দির নির্মাণ করিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে (১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার পবিত্র স্নানযাত্রাদিবসে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য হইল। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত সমাজপ্রথায় এই শুভকার্যে এক বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল। শূদ্রবংশীয়া রানীর প্রতিষ্ঠিত দেবীকে অন্নভোগ দিতে হইবে ভাবিয়া কোন সদ্‌ব্রাহ্মণই সেই প্রতিষ্ঠাকার্যে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার জীবনের সাধনা ও সংকল্প আজ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি অভীষ্ট দেবীর রাতুল চরণে প্রাণের আকুল প্রার্থনা জানাইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। অচিরে ঘোর অন্ধকারে আলোকের সন্ধান পাইয়া রানী আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। ঝামাপুকুর টোলের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় বিধান দিলেন যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে রানী যদি দেবালয়টি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণ কর্তৃক যথা-বিহিত প্রতিষ্ঠাদি কার্য সম্পন্ন হয় তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম ও সামাজিক প্রথা উভয়েরই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের এই দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিতেও কোন বাধা থাকিবে না। রানী দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকার দেবত্র সম্পত্তি সহ দেবালয় গুরুবংশীয় ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া স্বয়ং দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র হইয়া রহিলেন, এবং দেবীভক্ত রামকুমারকেই মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান পুরোহিতের সকল কার্যের ভার গ্রহণ করিতে সশ্রদ্ধ আহ্বান জানাইলেন। রামকুমারও সাময়িকভাবে এই পুণ্য কাজ সম্পাদনে ব্রতী হইলেন এবং সিহর নিবাসী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীর পূজকপদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রতিষ্ঠার দিন প্রভাত হইতে না হইতেই দক্ষিণেশ্বর পল্লী শত শঙ্খরোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। সুদূর কান্যকুব্জ ও বারাণসী, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কণ্ঠোত্থিত বেদগান, যজ্ঞব্রতী হোতাগণের মন্ত্রপাঠ ও স্থানে স্থানে সমবেত শাস্ত্রবিদ্‌গণের শাস্ত্রবিচার প্রভৃতিতে উদ্যানবাটী পুণ্যতীর্থে পরিণত হইল। শ্যাম শ্যামা শিবের সমবেত প্রতিষ্ঠা। রানীর পুণ্য মন্দির-প্রাঙ্গণ আজ শাক্ত শৈব বৈষ্ণবের সমন্বয়-সভা। মহাসমারোহে মন্দির-প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হইল। ক্রমে গদাধরও উদ্যান-সমন্বিত এই দেবালয়ে আসিয়া অগ্রজের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, আজ হইতে তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।*

ইহার অত্যল্পকাল পরেই ঠাকুরের পিতৃস্বস্রীয়া ভগিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় জীবিকার সন্ধানে দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সঙ্গীরূপে পাইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্তমনে রম্য দেবোদ্যানে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সৌম্যমূর্তি ও ভগবৎভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রানীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ বুদ্ধিমান জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস তাঁহাকে ভবতারিণীর বেশকারী-পদে এবং হৃদয়কে রামকুমার ও ঠাকুরের সাহায্যকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন।

---

* এখন হইতে আমরা গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ বা ঠাকুর নামে অভিহিত করিব। কেহ বলেন, রানী রাসমণির জামাতা শ্রীমথুরানাথ বিশ্বাস গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রদান করেন। আবার কাহারও মতে সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরী গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে ভূষিত করেন। শেষোক্ত মতটিই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে জন্মাষ্টমী পর্বোপলক্ষে আজ বিশেষ উৎসবের বিপুল আয়োজন। আনন্দে ও ভজনে মন্দিরভবন নন্দালয়ে পরিণত হইয়াছে। পূজান্তে রাধাকান্তজীর পূজক ক্ষেত্রনাথ গোবিন্দজীকে শয়নঘরে লইয়া যাইবার কালে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাওয়ায় শ্রীবিগ্রহের একটি চরণ ভগ্ন হইল। আশ্চর্যের বিষয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার নিপুণ হস্তে বিগ্রহের ভগ্নস্থান জুড়িয়া দিলেন এবং তাঁহার নির্দেশমত সেই মূর্তিরই যথাবিহিত পূজা হইতে লাগিল। মূর্তিভঙ্গের অপরাধে ক্ষেত্রনাথ চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলেন এবং তাঁহার স্থানে ঠাকুরই রাধাকান্তজীর পূজকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পূজার এই সুযোগ লাভ করিয়া ঠাকুরের বৈরাগ্যপ্রবণ মন অতি সত্বর গভীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতে লাগিল। পূজার সময় ঠাকুরের তেজোদীপ্ত দেহ দেখিলে মনে হইত যেন স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব পূজাসনে বসিয়াছেন। রামকুমারও তাঁহার কনিষ্ঠের নিষ্ঠা ও ভক্তিশ্রদ্ধা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীকালিকামাতা ও অন্যান্য দেবদেবীর শাস্ত্র-বিহিত পূজাদি শিখাইতে লাগিলেন। দেবীপূজায় শাক্তী দীক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ঠাকুর কলিকাতা নিবাসী শক্তিসাধক শ্রীকেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট হইতে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা-গ্রহণের পর মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণকেই অগ্রজের স্থলে স্থায়িভাবে ভবতারিণীর অর্চনাকার্যে নিয়োজিত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ রামকুমার শারীরিক দুর্বলতা-নিবন্ধন অল্পায়াসসাধ্য রাধাগোবিন্দজীর সেবাপূজার ভার গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে সর্বপ্রকার কার্য হইতে অবসর লইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময় জন্মভূমি দর্শনের জন্যও

তিনি উতলা হইয়া উঠিলেন। তাই তিনি ভাগিনেয় হৃদয়রামের উপর রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার অর্পণ করিয়া স্বগৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে কার্যোপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য শ্যামনগর মূলাজোড় নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে অবস্থান-কালে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে) তিনি সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অগ্রজের আকস্মিক মৃত্যুতে ঠাকুরের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্যানল দ্বিগুণভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। এখন হইতে অধিকাংশ সময় তাঁহার ভগবদ্‌ধ্যান, পূজা, প্রার্থনা এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রমুখ ভক্তগণ-বিরচিত ভজনে কাটিয়া যাইতে লাগিল। পূজান্তে গভীর নিশীথে পার্শ্ববর্তী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আমলকী বৃক্ষমূলে উপবীত ও পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগপূর্বক তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। কখনও দেবীপূজার আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্পাদি অর্পণ করিয়া দুই এক ঘণ্টা কাল স্থাণুর ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। আবার কখনও সুগন্ধ পুষ্পদ্বারা মনোহর মাল্য রচনা করিয়া জগজ্জননীকে মনের সাধে সজ্জিত করিতেন।

ক্রমে ভাবাবেগ ও ভক্তির উচ্ছ্বাস তাঁহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। মাতৃগতপ্রাণ সাধকের হৃদয়বিদারক ক্রন্দনরোলে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বিরামবিহীন অশ্রুজলে মাতৃচরণ সিক্ত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা-সমাগমে যখন শঙ্খঘণ্টা-রোলে রাত্রির আগমন-বার্তা ঘোষিত হইত, তখন আরও একটি দিন বৃথা গেল ভাবিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা শতগুণ বৃদ্ধি পাইত। তিনি আকুলকণ্ঠে বলিতেন, "ঐ তো মা, নর-পরমায়ু হরণ করিয়া আরও একটি দিন চলিয়া গেল,

তোমার দর্শন তো পাইলাম না, জননী! এত কাঁদি, এত সাধি, তোমার কি দয়া হবে না, মা?" বলিতে বলিতে অসহ্য ব্যাকুলতায় ভূমিতে লুটাইয়া মুখ ঘষিয়া তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইত।

একদিন বিরহজনিত তীব্র মানসিক বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া মাতৃচরণে আত্মবলি দিবার উদ্দেশ্যে মন্দিরগাত্রে বিলম্বিত অসি গ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইতেই সহসা জগন্মাতার দিব্য-দর্শন লাভ করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই ভাব-তন্ময়তার মধ্যে ঠাকুর দেখিলেন, "ঘরদ্বার, দেবমন্দির, বৃক্ষবল্লরী, উদ্যান, জীবজন্তুর কলরব সব ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে, এবং সেই শূন্য পূর্ণ করিয়া এক অন্তহীন চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র বিরাট তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া আলোকে আলোকে উচ্ছ্বাস তুলিয়া তাঁহার উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কোথাও কিছু নাই—আছে কেবল পুলক-ঝলসিত চিৎশক্তিবিলসিত জ্যোতিঃসমুদ্রের অগাধ অপার বিস্তার, আর সেই অপূর্ব আনন্দময় আলোক-সিন্ধুর মাঝে এক চিদ্‌ঘন আনন্দময়ী মূর্তি বরাভয়করা, অসীম করুণায় মৃদুমন্দহসিতাধরা।"* এই দিব্যানুভূতির পর জগদম্বার নিরন্তর দর্শনের লালসা তাঁহাকে আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

ঠাকুরের ভাব-তন্ময়তার প্রাবল্যে তাঁহার পক্ষে বৈধী পূজা যথারীতি সম্পাদন করা এখন হইতে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। মন্দিরের কর্মচারিবৃন্দ পূজাকালে তাঁহাকে বিধিশাস্ত্র-বিরোধী আচরণ করিতে দেখিয়া মথুরানাথের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। মথুরানাথ একদিন

---

* ৺দেবেন্দ্রনাথ বসু কৃত "পরমহংসদেব" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

সহসা পূজাকালে উপস্থিত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মাতৃভাবে বিভোর আত্মভোলা ঠাকুরের জগন্মাতার উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া এবং অপার্থিব আভায় জননীর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন—মা সত্য সত্যই প্রেমিক ঠাকুরের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া জাগ্রত হইয়াছেন—মন্দির-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে। ভক্তিমতী রানী রাসমণি মথুরানাথের নিকট সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অপর একদিন ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং স্বচক্ষে সবকিছু দেখিয়া মথুরানাথের মতই সমর্থন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরের একটি ঘটনায় কিন্তু মথুরানাথের বিশ্বাসী মনেও ঠাকুর সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক কিনা এই বিষয়ে সন্দেহের উদয় হয়। দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই রানী "ছোট ভট্টাচার্যের" মধুরকণ্ঠে মাতৃনাম শুনিতে চাহিতেন। ঠাকুরও ভাবতন্ময়চিত্তে গানের পর গান গাহিয়া চলিতেন। ঘটনার দিনে পূর্বেরই ন্যায় পূজান্তে রানী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ঠাকুর আবেগমধুর কণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত রানীকে শুনাইতে লাগিলেন। আকুলিত ভক্তহৃদয়ের ঘনীভূত প্রেম আজ সঙ্গীতের প্রতি মূর্ছনায় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ ভাবের বন্যায় মন্দির প্লাবিত, ভক্ত-সাধক প্রেমাবেশে আত্মহারা। সহসা সে মধুরকণ্ঠ থামিয়া গেল। শ্রোত্রীর কোমল অঙ্গে করাঘাত করিয়া ঠাকুর রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা?" রানী সঙ্গীত শ্রবণকালে মোকদ্দমা-বিশেষের ফলাফল চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন—তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বকৃত অপরাধের জন্য স্বয়ং অপ্রতিভ ও অনুতপ্ত হইলেন। তিনি ভক্ত সাধকের পুণ্যহস্তের এই শাসনকে

করুণার স্পর্শজ্ঞানে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। এবং এইজন্য পূজকের উপর যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয়, মন্দিরসংলগ্ন কর্মচারিবৃন্দের উপর এই মর্মে এক আদেশও জারি করিলেন। যাহা হউক, এই ঘটনার পর মথুরানাথ ঠাকুরকে বায়ুরোগাক্রান্ত মনে করিয়া তাঁহাকে কলিকাতার তদানীন্তন খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীনে রাখিলেন। কিন্তু এই চিকিৎসা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদনা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হইল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবায় মথুরানাথ

মথুরানাথ দিনের পর দিন যতই ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন ততই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে মোহিত হইয়া তাঁহার রাতুল চরণে নিজেকে বিকাইয়া দিতে লাগিলেন। মথুরের চরিত্রে দুইটি আপাতবিরোধী ভাবের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। তিনি একদিকে যেমন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, তেজস্বী ও তার্কিক, অপর দিকে তেমনই ধীর, গম্ভীর, ঈশ্বরবিশ্বাসী, দানশীল ও ভক্ত। বালকস্বভাব ঠাকুর দেবদুর্লভ সরলতার সহিত নিজের উপলব্ধিসমূহ ও অন্তরের নিগূঢ় কথা মথুরানাথের নিকট যতই অকপটে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, মথুরানাথও ততই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে এই অদ্ভুত সাধকের দেহমনাশ্রয়ে নানাবিধ অতীন্দ্রিয় দর্শনও মথুরের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। একদিন পঞ্চবটীর সন্নিকটে "বাবুদের কুঠী"তে মথুরানাথ একাকী আনমনে বসিয়া আছেন। সহসা দেখিতে পাইলেন ঠাকুর স্বীয় ঘরের

উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বারান্দায় আপনমনে আবিষ্টচিত্তে পাদচারণা করিতেছেন। ভ্রমণকালে একবার ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিত জটাজালসমন্বিত সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবরূপে প্রকটিত হইতেছেন, আবার ক্ষণপরেই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী আনন্দময়ী জগজ্জননীর রূপ ধারণ করিতেছেন। পুনঃ পুনঃ এই দিব্যদর্শনে বিভ্রান্ত মথুরানাথ বেগে ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অতিকষ্টে ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিলেন। এই দর্শনের পর হইতেই তাঁহার প্রতি মথুরের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও ঘনীভূত হইল।

অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু ঠাকুরেরও মথুরের প্রতি করুণার অবধি ছিল না। সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, আলোকে-আঁধারে, সর্বাবস্থায় তাঁহার কল্যাণ হস্ত মথুরানাথকে দুর্ভেদ্য বর্মের ন্যায় সর্বদাই ঘিরিয়া রাখিত। মথুরানাথ ঠাকুরের মধ্যে অলৌকিক ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ প্রেম, দেবদুর্লভ সরলতা ও সংযম, অদৃষ্টপূর্ব নিরভিমানতা ও অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি অপার করুণা ও ঐশ্বরিক শক্তির বিপুল বিকাশ দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন—ঠাকুরই তাঁহার জীবন-তরণীর কর্ণধার এবং বিপদসঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে একমাত্র ধ্রুবতারা। তাই পবিত্রতার জীবন্ত বিগ্রহ ঠাকুরের অভয়পদে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া মথুরানাথ ঠাকুরের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজের দেহ মন প্রাণ সর্বতোভাবে নিয়োজিত করিলেন এবং অচিরে অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

দিব্যোন্মাদ ও বিবাহ

ঠাকুরের জীবন-স্রোত এখন হইতে এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগন্মাতার সেই জ্যোতির্ঘন মূর্তি দর্শনের পর হইতে তাঁহার নিরন্তর অবাধ সাক্ষাৎকারের জন্য ঠাকুরের ব্যাকুলতা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। তাহার ফলে তাঁহার দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হুঁশও একপ্রকার চলিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, "শরীর-সংস্কারের দিকে আদৌ মন না থাকায় ঐকালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনি আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত।"

সর্বভাবময় ঠাকুরের মন কোন একটি মাত্র ধর্মমতের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। তিনি জগদম্বার দর্শন-লাভের পর নিজ কুলদেবতা রঘুবীরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং আপনাতে মহাবীরের দাস্যভাব আরোপ এবং তদনুরূপ আচরণ করিয়া নিশিদিন ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। একদিন পঞ্চবটী-তলে বসিয়া আছেন, সহসা দেখিলেন এক জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্বক ধীর ললিত গতিতে উত্তর দিক হইতে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এমন সময় একটি হনুমান আচম্বিতে সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই মূর্তির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তিনি অন্তরে অনুভব করিলেন—"ইনিই সীতা,—জনমদুঃখিনী সীতা, জনক-রাজনন্দিনী সীতা, রামময়-জীবিতা সীতা।" নিমেষে

সেই কমনীয়কান্তি মাতৃমূর্তি ঠাকুরের নিজদেহে মিলিত হইয়া গেল। আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত ঠাকুরের বাহ্য চেতনার বিলুপ্তি ঘটিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদের সংবাদ লোকমুখে অতিরঞ্জিত হইয়া কামারপুকুরে স্নেহময়ী জননী চন্দ্রাদেবীর নিকট পৌছিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল—পুত্রকে গ্রামের শান্ত শীতল পরিবেশের মধ্যে আনিতে পারিলে তাহার সকল ব্যাধির উপশম ঘটিবে। মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন কিংবা কার্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঠাকুর এখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। কিছুদিন এই শান্তিপূর্ণ স্থানে জননীর স্নেহচ্ছায়ায় অবস্থানের ফলে ঠাকুর পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ, সবল এবং শান্ত হইলেন বটে, তবে গ্রামের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত 'ভূতির খাল' ও 'বুধুই মোড়ল' নামক শ্মশানদ্বয়ে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রাদেবী মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন। মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া ঠাকুরই একদিন নির্দেশ দিলেন যে, "জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া রহিয়াছে।" এইরূপে তিনি স্বয়ংই পাত্রীর সন্ধান দিলেন। অচিরে শুভদিনে শুভক্ষণে তুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্ষীয়া কন্যা সারদামণির সঙ্গে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পরবর্তীকালে সারদাদেবীর সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন,—সারদা স্বয়ং সরস্বতী, তাঁহারই শক্তি। তাঁহারই কার্যসাধনের সাহায্যার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন সারদারূপে।

বিবাহের পর ঠাকুর প্রায় এক বৎসর সাত মাসকাল কামারপুকুরে অবস্থান করিয়া পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ববৎ জগন্মাতার ধ্যানচিন্তায় সম্পূর্ণ ডুবিয়া গেলেন। ঠাকুর এইকালের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া পরে বলিতেন, "এখন হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল—শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শনে ও অভয় বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম।"

এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরের ইতিহাসে অকস্মাৎ এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রানী রাসমণি হঠাৎ গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার ইষ্টদেবী জগজ্জননী কালিকাদেবীর অভয় চরণে মিলিত হইলেন। রানীর অন্তর্ধানের পর তাঁহার সুযোগ্য বিচক্ষণ জামাতা মথুরানাথই দেবসেবা সংক্রান্ত সমগ্র কার্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিয়া তৎকর্ম সাধনে তৎপর হইলেন।

তন্ত্র-সাধনা

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এক শুভ প্রভাতে গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা ভৈরবী বেশধারিণী জনৈকা পরমাসুন্দরী রমণী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র তিনি বুঝিতে পারিলেন—ইনি অনুপম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণও ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে পাইয়া সরল বালকের ন্যায় অন্তরের সকল কথা তাঁহার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন আলাপ আলোচনায় বিগত হইলে

বিদুষী ব্রাহ্মণী ঠাকুরের ভাবসমাধিতে মুহুর্মুহুঃ বাহ্য চৈতন্য লোপ ও সংকীর্তনে পরমোল্লাস দর্শন করিয়া এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত ঠাকুরের শরীরমনে প্রকাশিত লক্ষণসকলের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলেন—এবার একাধারে (শ্রীরামকৃষ্ণদেহে) শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব হইয়াছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী দৃঢ়কণ্ঠে আরও বলিলেন যে, শাস্ত্রসহায়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্য তিনি পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেও প্রস্তুত আছেন। শুনিয়া কৌতূহলী ঠাকুর পণ্ডিতগণের সভা আহ্বানের জন্য মথুরানাথকে অনুরোধ করিলেন। ফলে মথুরানাথের ব্যবস্থায় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইঁদেশের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও তান্ত্রিক সাধক গৌরীকান্ত তর্কভূষণ, কলিকাতা নিবাসী বৈষ্ণবশাস্ত্র-বিশারদ খ্যাতনামা পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ বিদ্বজ্জন এক বিচারসভায় সমবেত হইলেন। বিচার অধিকদূর অগ্রসর হইল না। বৈষ্ণবচরণ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সকল সিদ্ধান্তের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "প্রধান প্রধান যে উনবিংশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র 'মহাভাব' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং যাহা কেবলমাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ পর্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে তাহার সকল লক্ষণগুলিই ইহাতে (ঠাকুরে) প্রকাশিত বলিয়া বোধ হইতেছে।" ঠাকুর গৌরী পণ্ডিতকে বৈষ্ণবচরণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্বীয় মত জিজ্ঞাসা করায় গৌরীকান্ত দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে ? তবে তো ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোককল্যাণ সাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য সাধন করেন,

আপনি তিনি।" বালকস্বভাব ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা এত সব কথা বল, কিন্তু কে জানে বাপু, আমি তো কিছু জানি না।" শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসঙ্গগুণে উত্তরকালে গৌরীকান্তের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ঠাকুরের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া অচিরে সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে সাধন-ভজনে ডুবিয়া গেলেন।

গুরুপরম্পরাগত শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সাধন করাইবার জন্য প্রজ্ঞা-সম্পন্না সিদ্ধসাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়োপযোগী দুর্লভ বস্তুসকল বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহপূর্বক গভীর নিশীথে ঠাকুরকে নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ সহায়ে শিক্ষাদানের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। ঠাকুরও স্নেহময়ী জননী-সদৃশা ভৈরবীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তন্ত্র-সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এই সাধন সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মন এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িত যে, মালা ফিরাইতে যাইয়া সমাধিস্থ হইতাম এবং ঐ ক্রিয়ার শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম। এইকালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল। কঠিন কঠিন সাধন—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় সে সকল উত্তীর্ণ হইয়াছি।"

দক্ষিণেশ্বর সাধনপীঠে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নারীকে গুরুরূপে বরণ—স্বীয় সহধর্মিণীকে ষোড়শী দেবীরূপে আরাধনা—মাতৃভাবের সাধন—ইহা দ্বারা কি বর্তমান যুগের নারী জাতিরই অভ্যুদয় সূচিত হয় না?

বাৎসল্যভাবের সাধনা

ফুল ফুটিলেই মধুলোভে চারিদিক হইতে অলিকুল ছুটিয়া আসে। দক্ষিণেশ্বর তপোবনে শ্রীরামকৃষ্ণের সুরভিমধুর অধ্যাত্মজীবন-পুষ্প বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে কত পণ্ডিত, সিদ্ধ সাধক, যোগী, ভক্ত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী যে দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই এই অদ্ভুত ভাবোন্মাদের দিব্যসঙ্গ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন। পূর্বোক্ত গৌরীকান্ত, বৈষ্ণবচরণ ব্যতীত পণ্ডিত জয়নারায়ণ, ষড়দর্শনে সুপণ্ডিত রাজপুতনার নারায়ণ শাস্ত্রী, বর্ধমান রাজসভাপণ্ডিত সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার প্রভৃতিও শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মজ্ঞান-পূত জীবনের নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ১৮৬৪ সালের কোন একদিন জটাধারী নামক জনৈক রামভক্ত সাধক ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দীর্ঘকাল নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত রামলালা বিগ্রহের পূজা করিয়া বালক রামচন্দ্রের ভাবঘন মূর্তি দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ঠাকুর দিব্যদৃষ্টিসহায়ে এই গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অচিরে ঠাকুর জটাধারীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাৎসল্যভাবের সাধনায় চরমোৎকর্ষ লাভের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতিঃঘন শিশুমূর্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। রামলালা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "দেখতুম, সত্য সত্য দেখতুম—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখন আগে কখন পিছনে নাচতে নাচতে আসচে। কখনও বা কোলে উঠবার জন্য আবদার কচ্চে। আবার হয়ত কখন বা কোলে করে রয়েছি—কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল

থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাপাই জুড়বে। যত বারণ করি, 'ওরে অমন করিস্‌নি, গরমে পায়ে ফোস্‌কা পড়বে! ওরে অত জল ঘাটিস্‌নি ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জর হবে।' সে কি তা শোনে? যেন কে কাকে বল্‌ছে! হয়ত সেই পদ্মপলাশের মত সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো, আর আরো দুরন্তপনা করতে লাগলো বা ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গী করে ভ্যাঙ্‌চাতে লাগলো; তখন সত্যসত্যই রেগে বলতুম, 'তবে রে পাজি, রোস্, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো', বলে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি, আর এ-জিনিষটা ও-জিনিষটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের ভেতর খেলতে বলি। আবার কখন বা কিছুতেই দুষ্টামি থাম্‌ছে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতাম! মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে সজলনয়নে আমার দিকে দেখতো! তখন আবার মনে কষ্ট হ'ত, কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভুলাতাম। এ রকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম, করতুম। একদিন নাইতে যাচ্ছি, বায়না ধরলে সেও যাবে! কি করি, নিয়ে গেলুম! তারপর জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না, যত বলি কিছুতেই শোনে না। শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বল্লুম তবে নে কত জল ঘাঁটতে চাস্ ঘাঁট, আর সত্যসত্যই দেখলুম সে জলের ভিতর হাঁপিয়ে শিউরে উঠল। তখন আবার তার কষ্ট দেখে, কি কল্লুম বলে কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি।"

এইভাবে বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন ভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুর এখন মধুর-রসাশ্রিত মুখ্যভাব সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন—এই মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত

হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণ করিলেন এবং ঐ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইলেন যে, তাঁহার আপনাতে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া উঠিল। শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন অসম্ভব জানিয়া ঠাকুর এখন তদ্গত-চিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার প্রেমঘন মূর্তির স্মরণ, মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিতে লাগিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শনে কৃতার্থ হইলেন। উক্ত দর্শনের পর হইতে ঠাকুর কিছুকালের জন্য আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া নিরন্তর উপলব্ধি করিতে লাগিলেন এবং স্বল্পকাল পরেই সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, —ঐকালে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ব-বোধ হারাইয়া কখনও আপনাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিতেন, আবার কখনও বা আব্রহ্মস্তম্ব সকলকে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিতেন!

অদ্বৈত-সাধনা

ভাব-সাধনার সর্বোচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখন সর্বভাবাতীত 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নির্গুণ নিরাকার পরমব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য প্রবল প্রেরণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ঠাকুরের হৃদয়-মন যখন এইভাবে অদ্বৈত-সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রখ্যাত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর পুণ্যপীঠে আগমন করিলেন এবং ঠাকুরের সারল্যপূর্ণ প্রোজ্জ্বল মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়াই ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসী অনুভব করিলেন অদ্বৈত-সাধনের উত্তম অধিকারী আজ তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান। তাই প্রসন্ন চিত্তে রামকৃষ্ণ-দেবকে স্বীয় শিষ্যত্ব গ্রহণে আহ্বান জানাইলেন। সর্বতোভাবে ভবতারিণীর মুখাপেক্ষী বালকস্বভাব রামকৃষ্ণও দেবীর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তোতাপুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং শাস্ত্রবিহিত আত্ম-শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্তে পঞ্চবটী-সংলগ্ন কুটীরে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্বক সর্বস্বত্যাগরূপ সনাতন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ এবং সম্প্রদায়োচিত নাম ও চিহ্নাদি ধারণ করিলেন।

স্বামী তোতাপুরী বেদান্তোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরকে উপদেশচ্ছলে বলিলেন,—তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সেই এক চিৎসিন্ধু হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব; উহাতেই স্থিতি, আবার উহাতেই বিলয়। এই অদ্বয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তুতে মিথ্যা নামরূপের কল্পনাই সিন্ধুবক্ষে ফেনোর্মিবৎ সৃষ্টির বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে;—পরমার্থতঃ এক নিরুপাধিক অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জীবাদি দ্বিতীয় বস্তুর পৃথগস্তিত্ব নাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুর উপদেশ হৃদয়ে সম্যক ধারণপূর্বক দৃঢ় সঙ্কল্প সহায়ে মনকে ধীরে ধীরে নামরূপাত্মক দ্বৈতরাজ্যের অতীত ব্রহ্ম-স্বরূপে নিবিষ্ট করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে বিলীন হইলেন। দিবসত্রয় ঠাকুরকে এইভাবে সিদ্ধাসনে সমাসীন দর্শন করিয়া সমাধিতত্ত্বজ্ঞ তোতাপুরী সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "য়হ ক্যা দৈবী মায়া"—নির্বিকল্প সমাধি! পরে তাঁহার চেষ্টায় ক্রমে নির্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ঠাকুর শ্রদ্ধাবনত শিরে বিস্মিত পুলকিত শ্রীমৎ তোতাপুরীর পাদবন্দনা করিলেন। অদ্যকার এই পরম শুভ মুহূর্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে পঞ্চবটীর নিভৃত কুটীরে যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটিল, জগৎ এরূপ আর কতবারই বা দেখিয়াছে!

শিষ্যের অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রতিভা-দর্শনে ও তাঁহার সপ্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ক্রমান্বয়ে এগার মাস বিমল আনন্দে কাটাইলেন। নির্ভীক বলিষ্ঠদেহ তোতাপুরী বিদ্যা-অবিদ্যারূপিণী আদ্যাশক্তিকে শুদ্ধাদ্বৈতসাধনের পথে কখনও স্বীকৃতি জানান নাই। অথচ মহামায়াকে স্বীকার না করিলে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করাও সম্ভব নহে। তোতাপুরীর জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সম্পাদনের জন্যই যেন তাঁহার সুস্থ সবল দেহে অকস্মাৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধি আসন পাতিয়া বসিল। আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী রোগের কোন প্রকার উপশম না দেখিয়া ব্যাধিগ্রস্ত তুচ্ছ দেহটিকে গঙ্গা-সলিলে বিসর্জন দিবার উদ্দেশ্যে একদিন গভীর নিশীথে ভাগীরথীর অতল গর্ভে ডুবিবার চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য হইলেন না, তখন নির্বাক বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, "একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যন্ত জলও নদীতে নাই। একি ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!"

সহসা তোতাপুরীর অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে যেন বিশ্বদৃশ্যের উপর হইতে একটি দুর্ভেদ্য আবরণ খসিয়া পড়িল। বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে তোতা দেখিলেন—এক অগাধ, অপার, অনন্ত শক্তিসাগর বিচিত্রলীলায় তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপল, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ; প্রশান্ত অবস্থায় যিনি ব্রহ্ম, লীলায় তিনিই জগজ্জননী মহাশক্তি মা। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—মহাশক্তি মহামায়ার লীলানাট্যের নিত্য নব পটপরিবর্তন মাত্র। প্রশান্ত সরসীবক্ষে ফেন-বুদ্বুদ-তরঙ্গের উত্থান-পতনের ন্যায় অসীম চিৎ-সমুদ্রে অনন্ত কোটি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ও প্রলয়রূপে সেই মহাশক্তিরই চিরন্তন অভিনয় চলিতেছে। মধুর ও ভীষণ, সুন্দর ও কুৎসিত, সুখ ও দুঃখ, আলো ও আঁধার—এই সর্বদ্বন্দ্বময়ীরূপে প্রতিভাত এক অচিন্ত্য শক্তিই প্রতিনিয়ত নূতনকে পুরাতন, পুরাতনকে নূতন করিয়া তুলিতেছেন। একেরই বিচিত্র বিকাশ। নানা রূপে, নানা নামে একই চিন্ময় সত্তার লীলা-প্রতিভাস। একাধারে শিব ও শক্তি ; বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাই ধ্বনিত হইয়াছে, "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।" এই অপূর্ব অনুভূতি তোতাপুরীর অদ্বৈত-জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিল। হৃষ্টচিত্তে সুস্থদেহে পরম বৈদান্তিক তোতা আত্মবিৎ শিষ্যের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের সাধনা

অদ্বৈতভূমিতে আরূঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধ শান্ত মন এক সমুন্নত উদার-ভাবের রঙ্গভূমি হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সকল ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সুফি-সম্প্রদায়ভুক্ত গোবিন্দ রায়ের নিকট হইতে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিন দিবসের মধ্যেই শ্রীমহম্মদের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া ঐ মতের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রহিয়াছে। পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপ··· পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।" এই ব্যবধান দূর করিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ করাই যে যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমান ধর্মসাধনের অন্যতম উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এখানেই সকল ধর্মমত সাধনের পরিসমাপ্তি ঘটিল না। ঠাকুর কলিকাতার সিঁদুরিয়াপটি পল্লীনিবাসী ব্রাহ্মভক্ত দানবীর শ্রীযুক্ত শম্ভু মল্লিকের নিকট বাইবেল শ্রবণ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অন্তরে তীব্র ইচ্ছা অনুভব করিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের অতি সন্নিকটে শ্রীযদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটীর বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া দেয়ালে বিলম্বিত অনেক ছবির মধ্যে মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত ঈশার বালগোপাল মূর্তি দর্শন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া ঠাকুর তাঁহার বিচিত্র জীবনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন উক্ত দেবশিশুর অঙ্গ হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্বীয় দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিরপোষিত হিন্দুসংস্কারসমূহের আমূল পরিবর্তন করিয়া দিতেছে। দিবসত্রয় ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

অনন্তর তিনি পঞ্চবটীতে পরিভ্রমণকালে করুণার প্রতিমূর্তি এক দেব-মানবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বুঝিলেন—ইনিই সেই পরম প্রেমিক ঈশামসি, যিনি জীবোদ্ধারের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া অশেষ যাতনা অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন। ঠাকুর এইভাবে দ্বন্দ্ব-কোলাহল-মুখর বিশাল বিশ্বে সকলকে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য সর্বধর্মের সমন্বয়াত্মক 'যত মত তত পথ'-রূপ এক অচ্ছেদ্য মিলনসূত্র আবিষ্কার করিলেন।

জন্মভূমি-দর্শন

দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে ঠাকুরের দেহ ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। মথুরানাথ ও অপরাপর হিতৈষিগণের পরামর্শে ১৮৬৭ সালের মে মাসে ঠাকুর স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে জন্মভূমি কামারপুকুরে আগমন করিলেন। সঙ্গে তন্ত্রসাধন-নায়িকা ভৈরবী ব্রাহ্মণীও আসিলেন। ঠাকুরের সহধর্মিণী সারদাদেবী এখন চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা-দীক্ষাদি দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীমৎ তোতাপুরী ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া এক সময় বলিয়াছিলেন, "স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে।"

কামারপুকুরে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর স্বীয় ধর্মপত্নীর প্রতি কর্তব্য

তথা স্বকীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতার পরীক্ষায় ব্রতী হওয়ার পর হইতেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবনের অনিষ্টাশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং স্বল্প কারণেই উত্তেজিত হইয়া সারদাদেবী ও পরিবারবর্গের অন্যান্য সকলের সঙ্গে নানাপ্রকার বিসদৃশ আচরণ করিতে লাগিলেন। পরমকারুণিক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ভৈরবী মায়িক আবরণে বিভ্রান্ত হইয়া এরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতেছেন। সাধিকা ভৈরবী অচিরে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি এক শুভদিনে স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্যে প্রাণপ্রতিম ঠাকুরকে ভূষিত করিয়া নদীয়া-বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ-জ্ঞানে তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন এবং স্নেহবন্ধন ছেদনপূর্বক বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নির্বাধ বিচরণের সুযোগ পুনরায় লাভ করিয়া, কামারপুকুর পল্লীর শান্ত পরিবেশ পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের প্রশস্ত পথে যাত্রা করিলেন। শোনা যায় তিনি জীবনের শেষ দিবসগুলি শ্রীহরির লীলানিকেতন ব্রজপুরীতে পরমানন্দে অতি-বাহিত করিয়া সেই পবিত্র তীর্থে মহাযোগে আত্মলীলা সম্বরণ করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে প্রায় সাতমাসকাল পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়া হৃদয়ের সঙ্গে পুনরায় সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

তীর্থ-পর্যটনে

১৮৬৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী মথুরানাথ সস্ত্রীক শতাধিক ব্যক্তি সমভিব্যাহারে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ দর্শন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং হৃদয়রামকেও সঙ্গী করিয়া লইলেন। একে একে বৈদ্যনাথধাম, বারাণসী, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রসমূহ দর্শন করিয়া সকলে পরমানন্দ লাভ করিলেন। এই তীর্থ-পর্যটনোপলক্ষে মথুরানাথ মুক্তহস্তে অজস্র অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন।

কাশী ও শ্রীবৃন্দাবন-ধামে অবস্থানকালে ঠাকুরের নানাবিধ দিব্যদর্শন ও অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বারাণসী প্রবেশ করিয়াই ভাবনয়নে দর্শন করিলেন—শিবপুরী বারাণসী স্বর্ণ-নির্মিত। "যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সাধুভক্তগণের কাঞ্চনতুল্য সমুজ্জল, অমূল্য ভাবরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হইয়া ইহার বর্তমান আকারে প্রকাশ! সেই জ্যোতির্ময় ভাবঘন মূর্তিই ইহার নিত্যসত্যরূপ—আর বাহিরে যাহা দেখা যায় সেটা তাহারই ছায়ামাত্র।...ভারতের প্রায় ত্রিশ কোটি হৃদয়ের ভক্তিভাব এতকাল ধরিয়া এইরূপে এই নগরীতে যে সমভাবে মিলিত থাকিয়া ইহার এইরূপ বহিঃপ্রকাশ আনয়ন করিতেছে, একথা ভাবিয়া কাহার মন না স্তম্ভিত হইবে?"*

অপর একদিন ঠাকুর মণিকর্ণিকাদি পঞ্চতীর্থ দর্শন মানসে নৌকা-যোগে মণিকর্ণিকাঘাটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা তিনি কি যেন দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে নৌকার কিনারায় আসিয়া

---

* লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ তৃতীয় অধ্যায় (পৃঃ ১২৬-২৭) দ্রষ্টব্য।

ধীরস্থির নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। মুখে অপূর্ব দিব্যজ্যোতিঃ, অধরপ্রান্তে অপূর্ব হাসি, ভাবাবেশে তিনি সমাধিস্থ। ভাবের উপশম হইলে অন্যত্র প্রস্থানান্তর ঠাকুর মথুরানাথ প্রভৃতিকে এই দর্শন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "দেখিলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকৃতি এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে 'তারক ব্রহ্ম' মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার সংস্কারবন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপে বহুকালের যোগতপস্যায় যে অদ্বৈতানুভবের ভূমানন্দ জীবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা তাহাকে শ্রীবিশ্বনাথ সদ্য সদ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন।"

কাশীধামে অবস্থানকালে ঠাকুর প্রায় প্রত্যহ বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। দেবস্থানাদি ব্যতীত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসিদ্ধ সাধুসন্ন্যাসীদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীমৎ তৈলঙ্গস্বামী মৌনাবলম্বন করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে অবস্থান করিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখিলাম সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁহার শরীর আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন। তাঁহার অবস্থানে কাশী উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। উচ্চ জ্ঞানের অবস্থা। ইশারায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ঈশ্বর এক না অনেক?' তাহাতে ইশারায় বুঝাইয়া দিলেন—সমাধিস্থ অবস্থায় এক; নতুবা যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানাজ্ঞান আছে, ততক্ষণ

অনেক। তাঁহাকে দেখাইয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলাম, 'ইহাকেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে'।"

কাশীধামে কিছুকাল অবস্থান করিয়া মথুরানাথের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন করিতে আসিয়া ঠাকুর নিধুবনের সন্নিকট একটি বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া যুগযুগান্তরের স্মৃতি আজ ঠাকুরের মানসপটে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সেই যমুনা তরঙ্গ তুলিয়া কলস্বরে নাচিয়া ফুলিয়া চলিয়াছে; সেই নীল তমাল বৃক্ষরাজি—সেই কদম্ববন—কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে এখনও ভ্রমর-ভ্রমরী কৃষ্ণ-গুণ-গুঞ্জনে মাতোয়ারা; উচ্চপুচ্ছ শিখী পুলকে পাখা মেলিয়া বিচিত্র ভঙ্গিমায় নৃত্যপর। গোপ-গোপিনীর পদাঙ্ক-পূত রজ এখনও শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি বক্ষে বহন করিয়া বিদ্যমান। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীতের কুক্ষিগত হইয়াছে; কিন্তু ব্রজের জীবনধারা এখনও তেমনি সমভাবে সাবলীল ছন্দে প্রবাহিত। বৃন্দারণ্যের প্রতি বৃক্ষলতা, বন, উপবন, মন্দির দর্শনে ঠাকুরের অন্তরের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল এবং কৃষ্ণচন্দ্রের বিচিত্র লীলা ভাবনয়নে দর্শন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

কাশীর ন্যায় বৃন্দাবনেও তিনি বৈরাগ্যবান অনেক সাধক-সাধিকা দর্শন করিয়াছিলেন। নিধুবনে ষষ্টিবর্ষীয়া সিদ্ধসাধিকা গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধারাণী-জ্ঞানে আদর করিয়া দুলালী বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুরও এই বর্ষীয়সী তপস্বিনীর কৃষ্ণপ্রেমে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রাদেবীর কথা স্মরণ হওয়ায় বৃন্দাবনবাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। প্রায় চারিমাসকাল এইভাবে বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করিয়া

মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে আনীত রজ ঠাকুর স্বহস্তে পঞ্চবটীতে ছড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবন তুল্য দেবভূমি হইল।" ঠাকুর আরও একবার (১৮৭১ খৃঃ) মথুরের সঙ্গে তীর্থদর্শনে বহির্গত হইয়া কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও গমন করিয়াছিলেন। কালনায় শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে ও আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। নবদ্বীপধামে ঠাকুর ভাবনয়নে বালকবেশী মনোহরকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রভুপাদ নিত্যানন্দকেও স্বশরীরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ঐ তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন।

মথুরানাথের মৃত্যু

এইভাবে ঠাকুরের সেবায় ও দিব্য সঙ্গে মথুরানাথের প্রায় ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় মথুরানাথের হৃদয়-মন এখন নিষ্কাম ভাবে ও ভগবৎপ্রীতিতে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, বিপদসঙ্কুল সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র কাণ্ডারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই গুরুগতপ্রাণ মথুরানাথ ঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, শান্ত ও নিশ্চিন্ত। ১৮৭১ সালের জুলাই মাস আগত। সহসা মথুরানাথ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। ঠাকুর বুঝিতে পারিলেন মথুরের জীবন-দীপ নির্বাণোন্মুখ। সত্বর তাঁহাকে কালীঘাটে স্থানান্তরিত করা হইল। ঠাকুর কিন্তু এবার আর তাঁহাকে দেখিতে গেলেন না। মথুরের অন্তিমকাল

উপস্থিত হইলে ঠাকুর সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং জ্যোতির্ময় পথে সূক্ষ্মদেহে মথুরের নিকট উপনীত হইয়া এক অত্যুজ্জ্বল পুণ্যলোকে তাঁহার গতিবিধান করিলেন। মথুরের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের জীবন-নাট্যের এক স্মরণীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

ষোড়শী-পূজা

মথুরানাথের দেহত্যাগের পর প্রায় ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। সারদাদেবী এখন অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমা (সারদাদেবী) দাম্পত্য-জীবনের যে বিমল আদর্শ পতির পদপ্রান্তে বসিয়া শিখিয়াছিলেন, যে অতুলনীয় পবিত্র প্রেমের স্পর্শ পাইয়া তাঁহার অন্তর মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উপজীব্য ও পাথেয় হইয়া তাঁহাকে দিব্যপথের পথিক করিয়া তুলিয়াছিল। সারদাদেবী এই আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী হইয়া মনের উল্লাসে পিত্রালয়ে সুদীর্ঘ চার বৎসর কাটাইলেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বর হইতে লোকমুখে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হইয়া সংবাদ আসিতে লাগিল যে, তাঁহার দেবতুল্য পতি উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গদেহে হরিনাম করিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছেন। তচ্ছ্রবণে পতিপ্রাণা সারদার মন আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। ঠাকুরকে দর্শন করিবার এবং তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধিমান পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কন্যার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কন্যাসহ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বয়ংই পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপনীত হইলেন। পথশ্রমে

অনভ্যস্তা সারদা পথিমধ্যে দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অসুস্থ ও ক্লিষ্ট দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অতি স্নেহ-যত্নের সহিত তাঁহার চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং পরে নহবৎঘরে যেখানে তাঁহার বৃদ্ধা জননী চন্দ্রাদেবী বাস করিতেছিলেন, সেখানে তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীসারদাদেবীরও থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা দর্শনে উৎফুল্ল ও নিশ্চিন্ত হইলেন।

এইভাবে সারদাদেবীকে নিকটে পাইয়া কামারপুকুরে অবস্থান-কালে ঠাকুর তাঁহাকে মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার পরিপূর্ণতার জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীশ্রীমাও দিনের পর দিন ঠাকুরের সাহচর্যে অচিরেই পতির সাধনালব্ধ অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইলেন।

একদিন ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মনোভাব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" শ্রীশ্রীমা স্থির ও ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টান্‌তে আসব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।"

পদসম্বাহনরতা শ্রীশ্রীমাও একদিন দেবতুল্য পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" আত্মারাম ঠাকুর সহজ সরলভাবে উত্তর দিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখনও নহবতে বাস করছেন; আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" এই দেব-দম্পতির

আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নিষ্কলুষ ভাব ও উচ্চাদর্শ দেখিয়া কাহার না অন্তর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ইঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে স্বতঃই আনত হয় ?

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধানে গভীর সাধনায় নিমগ্ন হইয়া বিচিত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী হইতে লাগিলেন, এবং ক্ষুদ্রপরিসর ঐ নহবৎগৃহে সেবাস্বরূপিণী জননী সারদাদেবী বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা, নিজের স্বামী ও ভক্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দাম্পত্য-জীবনের এক অভিনব অধ্যায় রচনা করিলেন। এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন, অমাবস্যা তিথিতে, স্বীয় শয়নকক্ষে ফলহারিণী কালিকাদেবীর পূজার সমগ্র অয়োজন করিয়া, শ্রীশ্রীসারদা-দেবীকে আলিম্পন-ভূষিত আসনে বসাইলেন। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে দিব্যভাবে ভাবিতা স্বীয় সহধর্মিণীকে বিশ্বজননী ষোড়শীজ্ঞানে আরাধনা করিয়া ঠাকুর সুদীর্ঘ সাধনযজ্ঞে আজ পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর দাম্পত্য জীবন জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়। কামারপুকুরের পুণ্যভূমিতে যে দাম্পত্য-জীবন-তরু প্রথম অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফল-সম্ভারে মণ্ডিত, দক্ষিণেশ্বর তপোবনে তিমিরাঞ্চল ঘেরা অমানিশায় ষোড়শী মহাবিদ্যা-জ্ঞানে স্বপত্নী-পূজায় তাহারই পূর্ণ পরিণতি। এ পবিত্র দাম্পত্য-জীবন ভোগতপ্ত আর্ত মানবের চিরশান্তির নির্ঝর। শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ; সারদাদেবীও একাধারে গৃহিণী ও যোগিনী। শিব শক্তি দুইটি হৃদয় একই সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত,—দুইটি মহাভাবের চির-সম্মিলন ; যেথায় বিচ্ছেদ নাই, বিরহ নাই, আছে শুধু এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি এবং পবিত্র প্রেমের শাশ্বতী দ্যোতনা। এই স্বর্গীয় সমবায়

জগতে বিরল। ইতিহাস অনুরূপ দ্বিতীয় আলেখ্য অঙ্কন করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বর পুণ্যপীঠে নিরবচ্ছিন্ন সাধন, ভজন এবং শ্বশ্রূমাতা, পতি ও ভক্তের সেবায় একবৎসর চারিমাসকাল অতিবাহিত করিলেন এবং প্রাণে পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ লইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীধাম কামারপুকুরে ফিরিয়া আসিলেন।

ডাকাত বাবা

শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে প্রত্যাগমনের স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর মাত্র ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্বরাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার তিরোধানের পর তৎপুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদ গ্রহণ করেন। ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামকুমারের একমাত্র পুত্রের (অক্ষয়ের) কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কালক্রমে শিক্ষাদি লাভ করিয়া এই সুদর্শন যুবক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজা অতি ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত করিতেছিল। অক্ষয় যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিল। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডন করা কাহারও সাধ্য নাই। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পরেই অক্ষয় হঠাৎ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ইংরাজী ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেন। এইবার দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে

পথিমধ্যে তাঁহাকে এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সঙ্গীগণসহ তিনি পদব্রজেই আসিতেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার একটু পরেই তিনি এক ভীষণাকার ডাকাতের সম্মুখীন হন। মা তখন একেবারেই অসহায়, কারণ তাঁহার সঙ্গীরা কেহই নিকটে ছিল না। এই ঘোর বিপদেও কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া এই নরঘাতক ও তাহার স্ত্রীকে পিতা ও মাতা সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলিয়া তাহাদের আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর এই সহজ সরল ব্যবহারে পাইক-দম্পতির হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় আশ্রয় দিয়া পরদিন সঙ্গীদের নিকট পৌছাইয়া দিল। এইভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এই ডাকাত ও তাহার সহধর্মিণীর জীবনধারা এখন হইতে সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত হয়। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পূর্ববৎ ঠাকুরের জননীর সহিত নহবৎগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। প্রায় বৎসরাধিককাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের পর তিনি সহসা গুরুতর আমাশয়রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ব্যাধির বিশেষ কোন উপশম না হওয়ায় পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়া গ্রামস্থ দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরে হত্যা প্রদান করিলেন। দেবী প্রসন্না হইয়া ঔষধের নির্দেশ করিয়া দিলে তিনি সেই ঔষধ সেবন মাত্রই রোগমুক্ত হইলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণি-দেবী ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দক্ষিণেশ্বরে ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

ভক্ত-সমাগম

ঠাকুর ধ্যানাবস্থায় দিব্যদৃষ্টিতে এক সময় দেখিতে পাইয়াছিলেন— অচিরে অনেক ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্ত, ধর্মভাবাপন্ন গৃহস্থ ও প্রতিভাশালী শিক্ষিত নরনারী ধর্মলাভের জন্য তাঁহার সমীপে আগমন করিবেন। তাঁহাদের দর্শন করিবার জন্য ঠাকুর এখন অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তাঁহার সেই ব্যাকুলতা এত বৃদ্ধি পাইত যে, তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বাবুদের কুঠির ছাদের উপর হইতে চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিতেন। বিশ্বহিতের উন্মাদনায় ঠাকুর সেদিন ব্যাকুল কণ্ঠে যে ডাক দিয়াছিলেন তাহা দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া বিশ্ববুকে বিপুল সাড়া জাগাইয়া দিল। ধীরে ধীরে অগণিত ভক্তের সমাগমে দক্ষিণেশ্বর মুখরিত হইয়া উঠিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঠাকুর কখনও কখনও বিভিন্ন সমাজের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া সৎ-প্রসঙ্গাদি দ্বারা তদানীন্তন সমাজের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে ভালবাসিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-নেতা খ্যাতনামা বাগ্মী ধর্মপ্রাণ কেশবচন্দ্র সেনকে দর্শন করিবার জন্য ঠাকুর হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বেলঘরিয়া নামক স্থানে জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটীতে গমন করেন। ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুরের হৃদয়-গ্রাহী উপদেশ ও সরল মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া এখন হইতে শ্রীযুক্ত কেশব কীর্তন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিলেন। আবার ঠাকুরও কখন কখন কেশবের কলিকাতার 'কমলকুটীর'-এ উপস্থিত হইয়া মাতৃনাম-গানে ও সদালাপে সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রীতির

সম্বন্ধ এত দৃঢ় ও ঘনীভূত হইয়া উঠিল যে, কেশব মুক্তকণ্ঠে ঠাকুরের অমৃতোপম উদার বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া ধর্মপিপাসা মিটাইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মসমাজের সকল বাংলা ও ইংরাজী মুখপত্রই ঠাকুরের জ্ঞানগর্ভ বাণী ও মতামতের আলোচনায় পূর্ণ থাকিত। অধিকন্তু ঠাকুরের নিকট হইতে মূর্তিপূজার প্রকৃত তাৎপর্য শ্রবণ করিয়া এখন হইতে ব্রাহ্মনেতাগণও অনেকে সাকারোপাসনাকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে শিখিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, "ঈশ্বর-স্বরূপকে কেবলমাত্র সাকার বলিয়া নির্দিষ্ট করায় যে দোষ হয়, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ বলিয়া উহাকে নির্দেশ করিলেও তদ্রূপ দোষ হয়। কারণ ঈশ্বর সাকার জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিরাকার সগুণ ব্রহ্মস্বরূপে জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন। আবার সর্বগুণের অতীত থাকিয়া ঈশ্বর জীব, জগৎ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তুর নামরূপযুক্ত প্রকাশের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া সতত অবস্থান করিতেছেন।" শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভের পর এক সময় বলিয়াছিলেন, "ইহাকে দেখিবার আগে আমরা ধর্মজীবন কাহাকে বলে, কি বুঝিতাম? ইহার দর্শনলাভের পর বুঝিয়াছি যথার্থ ধর্মজীবন কাহাকে বলে।" কেশবচন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা এত গভীরভাব ধারণ করিয়াছিল যে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে কেশবচন্দ্রের দেহরক্ষার অব্যবহিত পরে ঠাকুর দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঐ সংবাদ (কেশবের মৃত্যু-সংবাদ) শ্রবণ করিয়া আমি তিনদিন শয্যাত্যাগ করিতে পারি নাই। মনে হইয়াছিল যেন আমার একটা অঙ্গ (পক্ষাঘাতে) পড়িয়া গিয়াছে।"

এইভাবে ঠাকুর সকলের মধ্যে ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার নবীন উদার ধর্মভাব সমাজ-শরীরে সঞ্চারিত করিবার জন্য পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হিন্দুধর্ম-প্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহিত কখনও দক্ষিণেশ্বরে, কখনও অন্যত্র মিলিত হইতে লাগিলেন। শ্যাম-শ্যামা-শিবের মিলনকেন্দ্র সিদ্ধ সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর সাগরসঙ্গম-সদৃশ মহাতীর্থে পরিণত হইল। এই পুণ্যতীর্থের সন্ধান পাইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত নরনারী দলে দলে আসিয়া ইহার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন।

পূর্বোক্ত মনীষিবৃন্দ ব্যতীত যে সকল অন্তরঙ্গ গৃহস্থ-ভক্ত এই সময়ে ঠাকুরের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভক্তবর রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, বলরাম বসু, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কথামৃতের লেখক 'শ্রীম' বা মাষ্টার মহাশয়), দুর্গাচরণ নাগ, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও অগণিত গৃহী-ভক্ত ঠাকুরের দুর্বার আকর্ষণে দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে শরণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব জীবনের সমস্যা সমাধান করিয়া জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রকৃষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ লাভ করিলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের শুদ্ধসত্ত্ব বৈরাগ্যবান ত্যাগী লীলা-সহচরগণ একে একে তাঁহার পার্শ্বে সমবেত হইতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া ধর্মপিপাসুগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণ-সাধন
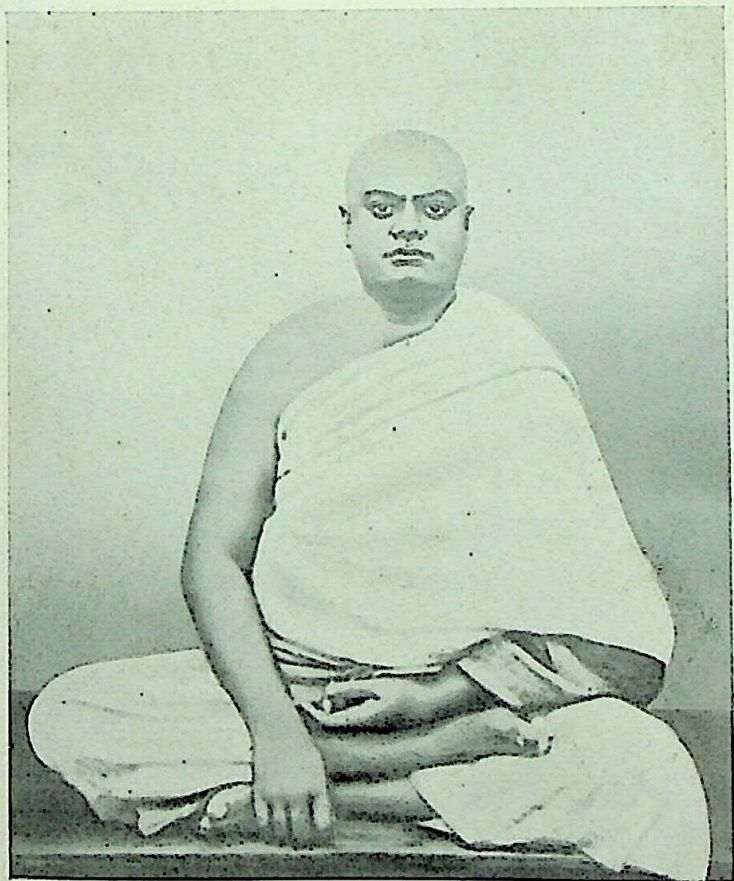
করিয়া গিয়াছেন এবং ত্যাগ ও সেবার সমুন্নত আদর্শ সর্বসাধারণের সম্মুখে স্থাপন করিয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববাহী সেই সকল সন্ন্যাসী সন্তানগণ আজ সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধার্হ।

উল্লিখিত ত্যাগী ভক্তগণের আগমন-প্রতীক্ষায় ঠাকুর কিরূপ ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন তাহার কতকটা আভাস আমরা ইতঃপূর্বেই দিয়াছি। এই সকল কৌমারবৈরাগ্যবান যুবকবৃন্দের মধ্যে যিনি পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী দেশদেশান্তরে প্রচার করিবার প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনিই কালে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যলীলার কথঞ্চিৎ আভাস এখানে দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক ঘোর সঙ্কটময় অবস্থায় উপনীত হন। একদিকে প্রাচ্যের সর্বংসহ আস্তিক্য-বাদ ও সার্বভৌম সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং অপরদিকে প্রতীচ্যের ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ—জড়বিজ্ঞানের দুন্দুভিনিনাদ। সত্যসন্ধ নরেন্দ্রনাথ কিন্তু পাশ্চাত্ত্যভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও আত্মবিস্মৃত হইলেন না। ধীর পদসঞ্চারে সত্যের সন্ধানে অভিযান আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থায় সাধক-শিরোমণি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধানে সন্দেহ-বাদী নরেন্দ্রনাথও একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রতীচ্য-শিক্ষাদৃপ্ত নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রশ্ন ধ্বনিয়া উঠিল, "আপনি কি ভগবান দর্শন করিয়াছেন?" প্রশান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি;

যেমন তোমাকে দেখিতেছি, তাহার চেয়েও স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।” নির্বাক বিস্ময়ে নরেন্দ্রনাথ উৎকর্ণ হইয়া সেই বাণী শুনিলেন। নরেন্দ্রনাথের নিষ্পলক মুগ্ধদৃষ্টি পূজারীর পবিত্র মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ হইল। শ্রদ্ধানত শিষ্যশিরে বরহস্ত প্রদান করিয়া প্রেমিক পুরুষ প্রেমভরে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সকল সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা সূর্যোদয়ে তিমির তিরোধানের ন্যায় কালক্রমে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া গেল, উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে তাঁহার হৃদয়মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) তদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে কিভাবে সেবাধর্মের গূঢ় তাৎপর্য অবগত হইয়াছিলেন সেই ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে স্বীয় কক্ষে বসিয়া রহিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে ঠাকুর সমবেত সকলকে উক্ত ধর্মের সারমর্ম সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিতেছেন, “তিনটি বিষয় পালন করিবার জন্য নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে,—‘নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন’।” ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে “কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার এই বোধে সর্বজীবে”—পর্যন্ত বলিয়াই সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। পরে অর্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “জীবে দয়া—জীবে দয়া! দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!” একমাত্র নরেন্দ্রনাথই উহার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি বুঝিলেন, বনের বেদান্তকে

ঘরে আনা যায়। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই নরেন্দ্রনাথ গুরুভ্রাতাগণকে বলিলেন, ঠাকুরের উক্তির মধ্যে তিনি আজ নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছেন। ঠাকুর দ্বৈতবাদীর ভক্তি ও অদ্বৈতবাদীর জ্ঞানের এক পরম সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। যোগী, সাধু-সন্ন্যাসী নির্জন অরণ্যে, গিরি-গহ্বরে বসিয়া যে অদ্বৈত-জ্ঞানের সাধনা করিয়া থাকেন সেই ব্রহ্মতত্ত্বই সকলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও দৈনন্দিন জীবনের প্রতি কার্যের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারে। একই ঈশ্বর জীব ও জগৎরূপে নাম ও রূপের মাধ্যমে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন। যিনি শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে পারিবেন, তিনিই কালে নিজেকে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন। প্রতিটি কর্মই তাঁহার উপাসনাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। পরবর্তীকালে স্বামীজী স্বরচিত 'সখার প্রতি' কবিতায় তাঁহার এই অনুভূতি মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—

"ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

জীবে শিববুদ্ধি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের অন্তরে কিরূপ স্বাভাবিক ছিল নিম্নোক্ত ঘটনা তাহারই পরিচায়ক।

"মথুরের সহিত কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাইবার কালে বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গ্রাম-বাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া 'বাবা'র (শ্রীরামকৃষ্ণের) হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। মথুরকে বলিলেন, 'তুমি তো মার দেওয়ান।

এদের একমাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও'। মথুর প্রথম একটু পেছপাও হইলেন। বলিলেন, 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক—এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?' সে কথা শুনে কে? 'বাবা'র তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না।' আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।' এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া 'বাবা'র কথামত কার্য করাইলেন। 'বাবা'ও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত কাশী গমন করিলেন।"*

ইহা দ্বারা পরমহংসদেবের মতে যে তীর্থদর্শন অপেক্ষা নরনারায়ণ-সেবা ন্যূন নহে তাহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়।

---

* উদ্ধৃতি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৪৪-৪৫

গোপালের মা ও মহিলাভক্তবৃন্দ

পূর্বোক্ত মনীষিবৃন্দ এবং গৃহী ও ত্যাগী ভক্ত ভিন্ন যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না মহীয়সী মহিলা এইকালে দক্ষিণেশ্বরে যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া আত্মজীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গোপালের মা (শ্রীঅঘোরমণি দেবী), যোগীন মা (শ্রীযোগীন্দ্র-মোহিনী বিশ্বাস), গোলাপ-মা (শ্রীগোলাপসুন্দরী দেবী) প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এস্থলে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত-সাধিকা অঘোরমণি দেবীর (গোপালের মার) ভক্তিরস-মণ্ডিত জীবনের মাত্র দুই-একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে।

অঘোরমণি ছিলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। শৈশবেই তাঁহার বিবাহ হয় এবং অল্পদিন পরেই তিনি বিধবা হন। এই বালবিধবা গঙ্গাতীরে এক ঠাকুরবাড়িতে একটু আশ্রয় পাইয়া গভীর নিষ্ঠার সহিত ভগবানের গোপালমূর্তির উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়া গেল। এই সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে এক সিদ্ধ সাধক বাস করেন শুনিয়া একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। এইভাবেই এই ভাগ্যবতী সাধিকার জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম দর্শনলাভ ঘটে। প্রথম দর্শনের দিন হইতে সাধিকা ব্রাহ্মণী অন্তরে অন্তরে পরমহংসদেবের উপর এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহার ফলে এখন হইতে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেলে একদিন শেষরাত্রে ব্রাহ্মণী সবিস্ময়ে দেখিলেন, পরমহংসদেব তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, অধরে মৃদু হাসি। সাহসে ভর করিয়া ব্রাহ্মণী স্বীয় বাম হস্তে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করা মাত্র

এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়া গেল, পরমহংসদেবের মূর্তি কোথায় লীন হইয়া গেল, তাহার স্থলে 'নবীন-নীরদ-শ্যাম-নীলেন্দীবরলোচন' বাল-গোপালমূর্তি ; হামা টানিয়া ব্রাহ্মণীর কোলে উঠিতে প্রয়াসী দেখিয়া মহানন্দে আত্মহারা ব্রাহ্মণী গোপালকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল গোপালের আবদারে ব্রাহ্মণীকে দিশাহারা করিয়া তুলিল। সেই আনন্দের তুফান-তরঙ্গে ব্রাহ্মণীর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো ভুল হইলই, এমন কি নিজের সম্বন্ধেও কোন হুঁশই আর রহিল না। তিনি গোপালকে বক্ষে ধারণ করিয়া ছুটিয়া চলিলেন দক্ষিণেশ্বরে—অর্থহীন উর্ধ্বদৃষ্টি, বসনাঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠিত, মুখে 'গোপাল' 'গোপাল' রব। এইভাবে তিনি একেবারে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরও তাঁহাকে কত আদর করিয়া সারাদিন নিজের সকাশে রাখিলেন, এবং স্বহস্তে আহার করাইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার গোপালকে বক্ষে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণী কামারহাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার জীবনে এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাব প্রায় দুই মাসকাল অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে। তারপর ক্রমে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ইষ্ট এবং শ্রীশ্রীঠাকুর অভিন্ন, তখন ক্রমে এই ভাব শান্ত হয়। এখন হইতে ঠাকুরকে তিনি গোপাল বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে গোপালের মা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এতদিনে তাঁহার 'গোপালের মা' নাম সার্থক হইল।

শ্যামপুকুরে

ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ক্রমে ক্রমে এক বৃহৎ ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল। দিনের পর দিন বহু নরনারী শান্তিলাভের জন্য তাঁহার অভয়পদপ্রান্তে উপনীত হইতে লাগিল। ঠাকুর জানিতেন যে, বিভ্রান্ত জনসমাজের সম্মুখে ত্যাগ ও সেবার উচ্চাদর্শ স্থাপন না করা পর্যন্ত তাহাদিগকে অমৃতপথের অভিযাত্রী করিয়া তোলা সম্ভব হইবে না। তাই তিনি অবিবাহিত কৌমার-বৈরাগ্যবান যুবকগণের ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ষোল আনা মন না দিলে ঈশ্বরের পূর্ণদর্শন কখনও লাভ হয় না। বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদিগের নিকট আছে, স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তি, মান, যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয় সকলে ছড়াইয়া পড়ে নাই ; এখন হইতে চেষ্টা করিলে ইহারা ষোল আনা মন ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে। এইজন্য ইহাদিগকে ধর্মপথে পরিচালিত করিতে আমার অধিক আগ্রহ।"

ঠাকুরের বিশ্রামহীন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ দিনদিনই দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। অধিকন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল হইতে তিনি সহসা গলদেশে এক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেকেরই ধারণা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে তৃষ্ণার্ত হইয়া বরফ-সংযুক্ত পানীয় দ্রব্যাদি অতিরিক্ত ব্যবহার করার জন্য এবং ভক্তবৃন্দের সহিত অবিরাম ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিবার জন্যই তাঁহার কণ্ঠদেশে এইপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই কঠিন ব্যাধি সত্ত্বেও ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহাদের সহিত ঠাকুর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানুষ্ঠিত পানিহাটির প্রসিদ্ধ মহোৎসবে (রঘুনাথ দাসের 'চিঁড়ার' মহোৎসবে)

যোগদান করিবার জন্য তথায় নৌকাযোগে গমন করিলেন এবং সেখানে পৌঁছিবামাত্র কীর্তনানন্দে ও উদ্দাম নর্তনে মাতিয়া উঠিলেন। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে দীর্ঘকাল এইভাবে থাকার ফলে তাঁহার গলদেশের বেদনা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিশেষভাবে রোগ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ধর্মযাজকদের যে কণ্ঠব্যাধি হইয়া থাকে, সেই ব্যাধিই তাঁহারও উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে গলদেশ হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। ব্যাধির প্রকোপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতার সন্নিকটে কোন স্থানে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ সকলে শ্যামপুকুর পল্লীতে বাড়ি ভাড়া করিয়া সেখানে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের মাঝামাঝি ঠাকুরকে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে রাখিলেন। উদারচেতা ডাক্তার সরকার যখন জানিতে পারিলেন যে, ঠাকুরের ভক্তগণ অতিকষ্টে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন তিনি বলিলেন, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোমাদিগের সৎকার্যে সহায়তা করিব।" পথ্যাদির সুব্যবস্থার ভার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন এবং শ্যামপুকুরের সেই বাটীর এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিয়া নীরবে নিঃশব্দে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া চারপাঁচজন যুবক-ভক্ত অভিভাবকগণের নানাপ্রকার বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও ঠাকুরের উদার ধর্মমত ও গভীর

আধ্যাত্মিকতায় এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, শ্যামপুকুরে আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতেন। চিকিৎসা ও সেবা নিয়মিতভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানের সংবাদ কলিকাতাবাসীর নিকট অবিদিত রহিল না। দলে দলে অমৃতপিয়াসী নরনারী সেখানে আসিয়া ভীড় জমাইয়া তুলিল। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও অকাতরে ভক্তসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন। মানব-কল্যাণের জন্যই যিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, তিনি দেহাত্ম-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া শরীরের চিন্তায় স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে বিরত থাকিবেন—তাহা কল্পনারও অতীত। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া ইতঃপূর্বেই ইহাকে দুরারোগ্য রোহিণী (cancer) রোগ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসাও অনুরূপই হইতেছিল।

এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনায় ভক্তগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ঠাকুর কেবলমাত্র অতিমানব নহেন, পরন্তু আধ্যাত্মিক জগতের পরমাশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব, মহাশক্তির অবতার। ঘটনাটি এই : প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শারদীয়া দুর্গাপূজার অবসানে শ্রীশ্রীকালী-পূজার দিন নিকটবর্তী হইল। জনৈক ভক্তের প্রবল ইচ্ছা যে, প্রতিমা আনয়নপূর্বক এবার শ্যামপুকুরে এই বাটীতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঠাকুরের শরীরের অসুস্থতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে এই আশঙ্কায় ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই এই কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিলেন না। পূজার পূর্বদিবস কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তকে ঠাকুর সহসা ডাকিয়া বলিলেন, "পূজার উপকরণ সকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখ—কাল কালীপূজা করিতে হইবে।" ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত আদেশ শ্রবণ করিয়া

ভক্তগণের আনন্দ ও উৎসাহের অবধি রহিল না। নির্দিষ্ট দিনে তাঁহারা যথারীতি গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, ফলমূল এবং মিষ্টান্নাদি পূজোপকরণ সকলই সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে সাজাইয়া রাখিলেন। পূজার শুভক্ষণ উপস্থিত। ধূপ-ধুনা-সুবাসিত গৃহখানি উজ্জ্বল দীপালোকে উদ্ভাসিত। সমগ্র স্থানটি এক অভূতপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশ ধারণ করিয়াছে। জগজ্জননীর চিন্তায় নিমগ্ন ভক্তবৃন্দ নির্নিমেষ নয়নে ঠাকুরের প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া আছেন। সহসা ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রের মনে উদিত হইল ঠাকুর স্বয়ংই পূজা গ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে আজ ধন্য করিবেন বলিয়া এই পূজার আয়োজন। এই চিন্তা উদিত হইবামাত্র আনন্দে অধীর হইয়া তিনি দুই হস্তে পুষ্প-চন্দনাদি গ্রহণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া ঠাকুরের রাতুল চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমগ্র দেহ রোমাঞ্চিত ও মুখকমল আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঠাকুর গভীর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া বরাভয় মুদ্রা ধারণ করিলেন। ভক্তগণ ঠাকুরের দেহে ভবতারিণীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সোল্লাসে 'জয় মা' ধ্বনি করিতে করিতে জগজ্জননী-জ্ঞানে ঠাকুরকে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর ভক্তগণের তৃপ্তি-সাধনকল্পে নিবেদিত মিষ্টান্নাদির কিঞ্চিৎ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং সকলকে বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালেই ঠাকুর একদিন দেখিতে পাইলেন বিবিধ ক্ষতসংযুক্ত তাঁহার সূক্ষ্মদেহ অন্নময় কোষ হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে বিচরণ করিতেছে। এই অদ্ভুত দর্শনে ঠাকুর বিস্মিত হইয়া

স্বীয় সূক্ষ্ম শরীর নিরীক্ষণ করিতেছেন—এমন সময় শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন, যে-সকল দুষ্কর্মকারী তাঁহার স্পর্শে পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে, তাহাদের পাপরাশি তাঁহার দেহে এই ক্ষত-রোগের সৃষ্টি করিয়াছে। ঠাকুরের শ্রীমুখে এই অত্যাশ্চর্য দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন যাহাতে কেহ ঠাকুরের পাদপদ্ম আর সহজে স্পর্শ করিতে না পারে।

ভক্ত-সঙ্গে ঠাকুরের লীলা নির্বাধ গতিতে পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। সুদক্ষ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের বিন্দুমাত্র উপশম লক্ষিত হইল না। অধিকন্তু ভক্তগণের সহিত অহর্নিশ অবিশ্রান্ত সৎপ্রসঙ্গ করার ফলে তাঁহার ব্যাধি দিন দিন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে লাগিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পরামর্শানুযায়ী ঠাকুরকে অচিরে কোন নির্জন উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। তদুদ্দেশ্যে ঠাকুরের অন্যতম গৃহী-ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের কাশীপুরের উদ্যানবাটীটি এইজন্য মাসিক ৮০৲ টাকা ভাড়ায় লওয়া স্থির করিলেন এবং সাগ্রহে স্বয়ংই উক্ত বাটীর সমগ্র ভাড়া বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্ত্যলীলাক্ষেত্র এই শান্ত স্নিগ্ধ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আগমন করিলেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে

কাশীপুর উদ্যানবাটীর মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া ঠাকুর খুবই প্রীত হইলেন। সেখানে প্রাচীরবেষ্টিত শ্যামল শষ্পাস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের স্থানে স্থানে আম্র, পনস, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষ, বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প ও স্বচ্ছসলিল দুই-একটি নাতিবৃহৎ জলাশয় অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শহরের বদ্ধ আবহাওয়া হইতে এই নির্জন আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া ঠাকুর কতকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলেন।

এখানে তিনি একটি সুমহান কর্তব্য-সাধনে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতি যুবক-ভক্তগণকে ত্যাগ ও সেবার উচ্চাদর্শে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য অধিকারী-ভেদে তাহাদিগকে শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদান করিতে যত্নবান হইলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার উদার ধর্মভাব, গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উচ্চ ত্যাগাদর্শ ধারণ করিবার এবং তাহা জগতে পরিবেশন করিবার জন্য সনাতন সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী সর্বত্যাগীর একান্ত প্রয়োজন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "মা তোকে তাঁর কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন ; আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়?" ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকেই তাঁহার পরিকল্পিত সংঘের নায়ক স্থির করিয়া বিশেষভাবে তাঁহারই জীবন গঠনে প্রথম হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপে বালক-ভক্তগণকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে কাশীপুরে আসিয়া তদ্বিষয়েও নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষাদি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্রনাথও ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্য অবসর সময়ে তাহাদিগের সঙ্গে শাস্ত্র-চর্চা,

ধ্যানজপ, ভজন, সদালাপ করিয়া তাহাদের অন্তরে বৈরাগ্যবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

শ্যামপুকুরের ন্যায় এই উদ্যানেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার সমগ্র ভার গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবক-ভক্তগণ ঠাকুরের সেবাকার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য সময়ের বিভাগ করিয়া স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্য নির্বাহ করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন; এবং গৃহী-ভক্তগণের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অনেকেই ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া অবসরমত এই সেবায় ব্রতী হইয়া শৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে এখানেও ভক্ত-সমাগম বাড়িতে লাগিল। ঠাকুরও তাঁহার ভাবামৃত-ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া সকলকে পরমশান্তির অধিকারী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রমে ও রোগের প্রকোপে ঠাকুরের ভগ্নদেহ আরও জীর্ণশীর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি প্রায় চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা ঠাকুরের অপার অহেতুক করুণার উজ্জ্বল চিত্রপট অপ্রত্যাশিতভাবে সকলের সম্মুখে উন্মোচন করিয়া দিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি। সেদিন অপরাহ্নে ত্রিশজনেরও অধিক গৃহী-ভক্ত উদ্যানে সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর আজ অনেকটা সুস্থবোধ করায় বেলা তিনটার সময় উদ্যানে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিলেন এবং উদ্যানপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ মুখে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গিরিশাদি ভক্তগণ এইভাবে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সহসা ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা

৫

(আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাসী গিরিশ নতজানু হইয়া ভক্তিবিহ্বলচিত্তে করজোড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারে নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি!" আচম্বিতে গিরিশের ভক্তির এই পরিচয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভাবের কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে সমবেত ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব? আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।" তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় ঠাকুরের আশীর্বাণী সকলের হৃদয়ে বিপুল পুলক জাগাইয়া তুলিল—তাঁহাদের শিরায় শিরায় আজ এক নবচেতনা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনুভূতির গভীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা আনন্দে ও উল্লাসে প্রমত্ত হইয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' রবে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিলেন; এবং একে একে ঠাকুরের অভয় পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন। আবার কেহ-বা উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করিতে লাগিলেন। উচ্ছ্বসিত ভাবের তরঙ্গে মুহূর্তে সে স্থান এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। ভাবাবিষ্ট ঠাকুরও একে একে ভক্তগণের বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে দিব্য আনন্দের অধিকারী করিয়া দিলেন। আজ ঠাকুরের দেহের ব্যাধি কোথায় যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রসন্নোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে বিমল হাসি—অক্ষিযুগলে স্বর্গীয় করুণার প্রদীপ্ত প্রকাশ, দেহে ঘনীভূত লাবণ্যের ভাস্বর বিলাস! আজ ঠাকুরের

দিব্য ভাবোদ্দীপ্ত প্রেমঘন মূর্তি দর্শনে ও তাঁহার অমোঘ আশীর্বাদ লাভে ভক্তবৃন্দ ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন।

ঠাকুরের কণ্ঠরোগের নানাপ্রকার চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্যের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ভক্তগণ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অবিশ্রান্তভাবে নিশিদিন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ঠাকুরের কথা বলিবার শক্তিও দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিল। তবুও তাঁহার করুণার অন্ত নাই—ভক্তদিগকে নানাভাবে উপদেশ দিবার জন্য এখনও সতত ব্যস্ত। নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া এই সময়ে ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "বাউলের দল হঠাৎ এল, নাচলে, গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। কেউ চিনলে না। এক একবার বলি, আর যেন আসতে না হয়।···আর যে দেহ ধারণ করা, এটি ভক্তের জন্য।"

ঠাকুরের জনৈক অন্তরঙ্গ ভক্ত (বুড়ো গোপাল) ত্যাগী সাধুসন্তকে গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর তাঁহার যুবক-ভক্তগণকে দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি এদের চেয়ে ভাল ত্যাগী সন্ন্যাসী আর কোথায় পাবে? তোমার গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষের মালা এদের দাও।" শ্রীযুক্ত বুড়োগোপাল ঠাকুরের নির্দিষ্ট ত্যাগী সন্তানগণকে উক্ত বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শুধু ইহাই নহে, ঠাকুর এক শুভ সায়াহ্নে তাঁহাদের জন্য এক বিশেষ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদিগকে মাধুকরী ভিক্ষার নির্দেশ দিলেন। আনন্দিত চিত্তে নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ যুবক-ভক্তগণ ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। এইভাবে ঠাকুর পুণ্যতীর্থ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্বহস্তে রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরকে অনেকবার প্রার্থনাও জানাইয়াছিলেন। সময়ে অখণ্ড জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়া ঠাকুরই তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। আশা-প্রতীক্ষায়, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা ও ধ্যানজপের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রনাথের দিন যাইতেছিল। একদিন সন্ধ্যায় ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার অন্তর্মুখী নির্মল মন ধীরে ধীরে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ রাজ্যের সমগ্র বন্ধন ছেদন করিয়া দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত নির্বিকল্প সমাধি-সাগরে বিলীন হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্নিধানে আগমন করিলে ঠাকুর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলে। কিন্তু তোর এই উপলব্ধি এখন তালাবন্ধ থাকবে। চাবি আমার কাছে রইল। তুই মায়ের যে কাজের জন্য এসেছিস্ তা শেষ হলে আবার পাবি।"

মহাপ্রস্থান

মহাপ্রয়াণের আট নয় দিবস পূর্বে ঠাকুর যুবক-ভক্ত যোগীনকে (স্বামী যোগানন্দকে) বাংলা পঞ্জিকার ২৫শে শ্রাবণ (৯ই আগস্ট) হইতে দিন-তিথি পড়িয়া যাইতে আদেশ করিলেন। শ্রাবণের শেষ তারিখ পর্যন্ত পৌঁছিবামাত্র ঠাকুর ইশারা করিয়া তাহাকে আর পড়িতে নিষেধ করিলেন। ইহার চার পাঁচ দিন পরে তিনি নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার নির্জন কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার প্রতি অপলক নেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গভীর সমাধিমগ্ন

হইলেন। নরেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যেন এক প্রচণ্ড সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তি প্রবল তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতেছে। সেই বিপুল বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া নরেন্দ্রনাথও অচিরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন; কতক্ষণ যে ঐরূপে কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যখন বাহ্যচেতনা ফিরিয়া আসিল তখন তিনি দেখিলেন ঠাকুর সাশ্রুনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হয়েছি। এই শক্তির সাহায্যে তুই জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইবি। কার্য শেষ হইলে আবার স্বস্থানে ফিরে যাবি।" ঠাকুর তাঁহার অমোঘ দিব্যশক্তি নরেন্দ্রনাথের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া এখন হইতে ভাবরাজ্যে তাঁহার সহিত অভিন্নাত্মা হইলেন।

এই ঘটনার দুইদিন পরেই নরেন্দ্রনাথের চিত্তে সহসা ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে এক সন্দেহ জাগিয়া উঠিল;—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই আসন্ন মৃত্যুকালেও যদি একবার বলিতে পারেন যে 'আমি অবতার' তবে আর সন্দেহ থাকিবে না।" নরেন্দ্রনাথের অন্তরে এই চিন্তার উদয় হওয়ামাত্র অন্তর্যামী ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "এখনও অবিশ্বাস? যে রাম, যে কৃষ্ণ, তিনিই ইদানীং এ দেহে রামকৃষ্ণ; তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" উক্তি-শ্রবণে ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের তথা ভবিষ্যৎবংশীয়দের সকল সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল।

ঠাকুরের জীবনদীপ আজ নির্বাণোন্মুখ। অন্তিমশয্যায় শায়িত তাঁহার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তগণ নিজদিগকে কত অসহায় ও ভাগ্যহীন বলিয়া মনে করিতেছেন। কে তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের

সমগ্র সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে? দুঃখ-বেদনায় কে সমবেদনায় ভরা হৃদয় লইয়া তাঁহাদের ব্যথিত অন্তরে শান্তির অমিয় প্রলেপ দিয়া সকল গ্লানি দূর করিয়া দিবে? তাই দুর্গম বন্ধুর পথে অভিযাত্রিদল আজ সঙ্গীহীন, সর্বসম্পদহারা হইবার এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে।

ঠাকুরের অন্ত্যলীলাক্ষেত্র কাশীপুর উদ্যানে তাঁহার মহাপ্রয়াণের প্রাক্‌কালীন দিবসগুলি তাঁহার অপার করুণা ও অমিত ঐশী শক্তির বিকাশে মহিমোজ্জ্বল হইলেও তাঁহার জীবনে ধূসর গোধূলি-লগ্নে মহা-প্রস্থানের প্রস্তুতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে ভক্তগণের অন্তর্জগৎ জমাট-বাঁধা গাঢ় অন্ধকার, মর্মন্তুদ বেদনা ও হাহাকারে ভরিয়া উঠিল।

আজ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট; ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার, শ্রাবণ-সংক্রান্তি; ঠাকুরের পঞ্জিকা-নির্দিষ্ট সেই অন্তিম দিন আগত। জনৈক ভক্ত ঠাকুরের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন তাঁহাদের প্রাণ-পুরুষ আজ সকলকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অসহায় ভক্তবৃন্দ তাঁহার শয্যার চারিধারে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল—ঠাকুর সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। দেহ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল ও নিস্পন্দ। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে ঠাকুরের বাহ্যচেতনা ফিরিয়া আসিল। তিনবার স্পষ্টভাবে জগজ্জননী কালী নাম উচ্চারণ করিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে সহসা সমগ্র শরীর বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুখমণ্ডল স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, দেহে অনির্বচনীয় কান্তি! কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না—এই উজ্জ্বল দিব্য প্রকাশ নির্বাণোন্মুখ দীপের

শেষ রশ্মি-ঝলক মাত্র। পরদিন ১৬ই আগস্ট সোমবার রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধি-যোগে স্ব-স্বরূপে বিলীন হইলেন।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে কাশীপুর শ্মশানস্থলীতে ঠাকুরের পবিত্র দেহ হোমানলে আহুতি প্রদত্ত হইল। ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের পূতাস্থি ও দেহভস্মাবশেষ সংগ্রহ করিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ভস্ম ও অস্থির অধিকাংশ বাগবাজার পল্লীস্থ বলরাম বসুর বাটীতে সাম্প্রতিকভাবে রক্ষিত হইল এবং অবশিষ্টাংশ শ্রীরামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছি বাগানবাটীতে গৃহী ও যুবক-ভক্তগণ মিলিত হইয়া পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথিতে যথাবিধি সংস্থাপিত করিয়া নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা-সংবরণে ভক্তগণ বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ত্যাগী যুবকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যুগপ্রয়োজনের যে ঐকান্তিকতায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইবে কিরূপে? কর্ণধারের আকস্মিক অদর্শনে আরোহিগণ যেরূপ ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের ফলে ত্যাগী যুবকগণ সেইরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেও, তাঁহাদের এই বিহ্বলতা নিতান্ত সাময়িকই হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে এবং পরবর্তীকালে শ্যামপুকুর ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যিনি সশরীরে এই ত্যাগী যুবকগণকে তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্য ও সেবাধিকার দিয়া এক অপূর্ব সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা দিতেছিলেন তিনি এখন হইতে এই নশ্বর জীবনের নেপথ্য-ভূমিতে দাঁড়াইয়া তাঁহার লীলাসহচরগণকে কোন এক নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন।

ভক্তবর বলরাম বসুর বাটীতে সংরক্ষিত ঠাকুরের দেহাবশেষের মধ্যেই ত্যাগী ভক্তবৃন্দ অনন্তভাবময় ঠাকুরের জাগ্রত সত্তাকে অনুভব করিয়া অনতিকালমধ্যেই বরাহনগরের এক জীর্ণ বাসভূমিতে ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও আসন স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং এইখানেই তাঁহারা বৈদিক প্রথাগত যথারীতি বিরজাহোম সম্পন্ন করিয়া সনাতন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-বিহিত নাম ও গৈরিক বসন ধারণপূর্বক পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন।

বিধাতার ইঙ্গিত অনেক সময়ই অজ্ঞাত ও গূঢ় হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে ভাগীরথী-তীরস্থ বরাহনগরের নির্জন নিভৃত জীর্ণ এই বাসভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ নবীন সন্ন্যাসিবৃন্দ অচিরকালের মধ্যেই অলোকসামান্য ত্যাগ ও তপস্যার এক জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করিলেন। তখন কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে এই জ্যোতির্বলয়ের দ্যুতিতরঙ্গ একদিন ভাগীরথীর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া সুদূর আটলাণ্টিকের তটভূমিকে স্পর্শ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সিদ্ধির অপূর্ব বার্তা দিকে দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে!

স্বামী তেজসানন্দ

পূর্বাভাস

জগতে প্রচলিত যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদই যে প্রাচীনতম ইহা সকল পণ্ডিত-সমাজই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। আর সকল ধর্মেরই মূলকথা বেদে পাওয়া যায়। তাই একথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে বেদই সকল ধর্মের উৎপত্তি-স্থল। মনুষ্য-রচিত কোন গ্রন্থের সহিতই বেদের তুলনা হয় না। বেদ কোন মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ নয়। লেখন-প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার বহুকাল পূর্ব হইতেই বেদ প্রচলিত আছে। বেদের মন্ত্রসমূহ গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া শিষ্যকে শিখিয়া লইতে হইত। এই জন্য বেদের এক নাম শ্রুতি। আর যেহেতু মুখস্থ করিয়া রাখা ভিন্ন বেদ রক্ষার অন্য উপায় ছিল না, এই জন্য দ্বিজাতিদের পক্ষে নিত্য বেদগান ছিল বাধ্যতামূলক, এবং বৈদিক যাগযজ্ঞাদির মধ্যেও অনেকগুলিই ছিল নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

কথিত আছে যে প্রতি মহাপ্রলয়ের পরে নূতন সৃষ্টি করিবার জন্য সৃজন-কর্তা ব্রহ্মা ধ্যানে বসেন; তখন তাঁহার নিকট বেদ প্রকটিত হয়। এই বেদের সাহায্যে পূর্ব পূর্ব যুগের ক্রমে, তিনি আবার নূতন সৃষ্টি করেন। আবার প্রথমে তিনিই ঋষিদিগকে বেদ শিক্ষা দিয়া থাকেন।

বেদ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুইভাগে বিভক্ত। যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের বিষয়। উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। সকল উপনিষদ্‌ই কোন না কোন বেদের অঙ্গীভূত। বেদান্ত বলিতেও সাধারণতঃ উপনিষদ্‌কে বুঝায়। কারণ উপনিষদ্‌সমূহ আছে বেদের শেষাংশে।

বেদের উপনিষদ্-অংশকে যে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয় তাহার কারণ বোধ হয় এই যে উপনিষদের মন্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যায় পরমজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান।

বেদ কোন জাতি-বিশেষের নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র নহে। সমগ্র মানব জাতিরই ইহাতে তুল্য অধিকার। ভারতীয় আর্য সন্তানগণের গৌরবের বিষয় এই যে—যে কারণেই হউক না কেন বেদ রক্ষা ও তাহার প্রচারের দায়িত্ব স্থূলভাবে তাঁহাদেরই।

প্রার্থনা

মনের ঐকান্তিকতা ভিন্ন কোন মহৎ কার্য-সম্পাদন সম্ভব হয় না। এই জন্যই মহৎ কার্যের প্রারম্ভে মনের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য বিরাট শক্তিশালী দেবতার স্মরণ করা প্রয়োজন। মহাপ্রভাবশালী দেবতা প্রভৃতির দিকে মন আকৃষ্ট হইলে মনের বিক্ষিপ্তভাব দূর হইয়া যায়। সুতরাং শান্ত ও একনিষ্ঠ হইয়া কর্তব্য সম্পাদনের উপযোগী হওয়া যায়। ইহাই প্রার্থনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

মুণ্ডক

হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণে মঙ্গলবাণী শ্রবণ করি, হে পূজ্য দেবগণ, আমরা চক্ষে যেন সৎ বস্তু দর্শন করি, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীর যেন দৃঢ় হয় এবং আমরা যেন আপনাদের স্তুতিগান করিতে করিতে দেবনির্দিষ্ট পরমায়ু প্রাপ্ত হই।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি[১]।

১। ত্রিবিধ বিঘ্নের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক (দৈহিক রোগ) আধিদৈবিক (দৈব-দুর্ঘটনা), আধিভৌতিক (হিংস্র জন্তুর হিংসাদি) বিঘ্নের বিনাশ হউক।

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্; আবিরাবীর্ম এধি; বেদস্য ম আনীস্থঃ; শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ; অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি; ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু; অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ঐতরেয়

আমার বচন মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, মন বচনে প্রতিষ্ঠিত হউক (অর্থাৎ মন মুখ এক হউক)। হে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকটিত হও। তোমরা উভয়ে (হে বাক্য ও মন তোমরা) আমার নিকট বেদার্থ আনয়ন-সমর্থ হও। আমি যাহা শ্রবণ করিব তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। আমি অহোরাত্র অধীত বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত থাকিব। আমি সত্য প্রকাশ করিব, সত্য কথা বলিব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্ ॥

তৈত্তিরীয় ১।১

আমাদের প্রতি মিত্রদেব মঙ্গলপ্রদ হউন, বরুণদেব মঙ্গলপ্রদ হউন, অর্যমা (অর্থাৎ চক্ষু ও সূর্য-মণ্ডলের অভিমানী দেবতা) সুখ-বিধায়ক হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমাদের প্রতি মঙ্গলপ্রদ হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু, তোমাকে নমস্কার, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, ইহা বলিব। তুমিই সৎ ইহা বলিব ; তুমিই সত্য ইহা বলিব। তিনি (ব্রহ্ম) আমাকে রক্ষা করুন, তিনি আচার্যকে রক্ষা করুন। তিনি আমাকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন।

তৎসবিতুর্বরেণ্যম্। মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ। ভূঃ স্বাহা।
ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ভুবঃ স্বাহা।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। স্বঃ স্বাহেতি॥

বৃহদারণ্যক ৬।৩।৬

তিনি সূর্যেরও বরণীয় ; বায়ুসমূহ মধুবাহী হউক, নদীসকল মধুস্রোতা হউক, আর আমাদের ওষধিসমূহ মধুর হউক ; ভূলোক, স্বাহা। আমরা জ্যোতিষ্মান্ দেবের ধ্যান করি, রাত্রি ও দিন সমূহ মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক, আমাদের পিতাস্বরূপ দ্যুলোক মঙ্গলদায়ক হউন ; অন্তরীক্ষলোক, স্বাহা। যিনি (সূর্য) আমাদের বুদ্ধি পরিচালিত করেন—; সোম আমাদের নিকট মধুর হউক, সূর্য সুখদায়ক হউন, দিক্‌সকল আমাদের শুভদায়ক হউক ; দ্যুলোক, স্বাহা।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।১২

যে বিশ্বপালক সর্বজ্ঞ রুদ্র দেবগণেরও উৎপত্তি ও উৎকর্ষের বিধাতা, যিনি ব্রহ্মারও আবির্ভাবের সাক্ষী, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধী
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।২২

হে রুদ্র, আমরা সর্বদাই যজ্ঞে তোমার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে, আমাদের পুত্রপৌত্রাদি, আমাদের গবাশ্ব পশু এবং আমাদের বলশালী অনুচরদিগকে বিনাশ করিও না।

শিক্ষা

সত্যকে জানাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। যাহা মানুষকে পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দেয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। সত্যের বিমল জ্যোতিতে হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইলে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে, অনাবিল শান্তির অমৃতরসে জীবন পরিপূর্ণ হয়। সত্য বৃহৎ ও এক এবং চির অম্লান। এই জন্যই উপনিষদ্ ভূমাস্বরূপ ব্রহ্মকেই এক মাত্র সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সত্যকে জানিবার জন্য ত্যাগ, বৈরাগ্য, মননশীলতা প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের যাহা অনুকূল তাহাও প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য। সর্ববিধ বিকারশূন্য, নামরূপবর্জিত অখণ্ড ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ। ইহাই সমগ্র উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য। কিন্তু ঐরূপ সত্যকে জানিতে হইলে বহির্বিশ্বে দৃশ্যমান পদার্থসমূহের মূল তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। জাগতিক সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া শেষ পর্যন্ত ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে এক সৎ পদার্থই সর্বত্র বিভিন্ন নামরূপের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইতেছে। সুতরাং জাগতিক পদার্থ পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষিত না হইলে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিভাত হইতে পারে না। এইজন্য প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে। ঐরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইলে বংশবিদ্যা, চরিত্র ও সাধন-প্রাচুর্য জনিত আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়সাধনলাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে গুরুর উপদেশ অনুসারে তত্ত্ব-বিশ্লেষণরূপ উপাসনার সাহায্যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়। এই বিষয়টি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে সনৎকুমার ও নারদের আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ অতি স্থূল বিষয় নাম হইতে আরম্ভ করিয়া কিভাবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারা যায় সোপানারোহণক্রমে তাহা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা এতই হৃদয়গ্রাহী যে উহার কোন অংশই বর্জনীয় নহে মনে করিয়া এখানে সম্পূর্ণ আখ্যায়িকাটি উদ্ধৃত করা হইল।

ওঁ। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্ধ্বং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ ॥

ছান্দোগ্য ৭।১।১

নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, আমাকে শিক্ষা দিন।" সনৎকুমার বলিলেন, "তুমি যাহা শিখিয়াছ তাহা প্রকাশ করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। তাহার পর হইতে আমি তোমায় শিক্ষা দিব।" নারদ বলিলেন—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতি-হাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকো-বাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্র-বিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১।২

"হে ভগবন্, আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, নৈসর্গিক বিদ্যা, নিধিসম্বন্ধীয়

বিদ্যা,[১] তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, জড়বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছি।"

সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিচ্ছ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্‌-দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি তং হোবাচ যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ ॥

ছান্দোগ্য ৭।১।৩

"হে ভগবন্‌, আমি এই সব অধ্যয়ন করিয়াও কেবল মন্ত্রবিদ্‌ হইয়াছি; আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই। আপনার ন্যায় জ্ঞানীদের নিকট শুনিয়াছি যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোকাতীত হন। হে ভগবন্‌, ঐরূপ আমি শোক করিতেছি। আপনি আমাকে শোক হইতে ত্রাণ করুন।" সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ, তাহা আক্ষরিক বিদ্যামাত্র।"[২]

১। নিধি অর্থ ভূগর্ভে নিহিত ধন; যে যে স্থানে নিধি থাকে তাহার লক্ষণ নিধিশাস্ত্রে কথিত আছে।

২। অভিধান বা নামমাত্রই মন্ত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে। যাঁহার যাহা প্রসিদ্ধ নাম সেই নামই তাঁহার একটি মন্ত্র। ঋষিগণ বলিয়াছেন—স্বনাম সর্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে, অর্থাৎ স্বীয় নামই সমস্ত পদার্থের মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—সর্বো হি শব্দঃ অভিধানমাত্রম্‌। অভিধানং চ সর্বং মন্ত্রেষু অন্তর্ভবতি। অর্থাৎ সমস্ত শব্দই কেবল অভিধান বা নামমাত্র। অভিধানমাত্রই মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সাধারণতঃ নাম বলিলে আমরা শব্দ এই অর্থই বুঝিয়া

নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বণশ্চতুর্থ ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্বাকোবাক্য-মেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্প-দেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১।৪

"ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, ইতিহাস পুরাণাদি পঞ্চমবেদ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, নৈসর্গিক বিদ্যা, নিধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, জড়বিজ্ঞান, ধনুর্বিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র—এই সমস্তই কেবল নাম। নামের উপাসনা কর।"

স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকাম-চারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১।৫

"ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে যিনি নামের উপাসনা করেন, যতদূর নামের গতি তাঁহারও ততদূর পর্যন্ত যথেচ্ছ গতি হইয়া থাকে।" (নারদ বলিলেন) "নাম অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার) "নামের

থাকি। প্রকৃত পক্ষে এখানে সেরূপ অর্থ নহে। বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। অর্থাৎ বিকার বা 'জন্য' পদার্থমাত্রই নামরূপাত্মক শব্দময় নামমাত্র। সুতরাং এখানে নামৈব এইরূপ বলায় ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি বিদ্যা, বিদ্যাফল ইত্যাদি সমস্ত অনিত্য বিনাশী বস্তুকেই বুঝিতে হইবে। কারণ ঐরূপ কর্মফলের অনিত্যতা দর্শনের ফলেই মহর্ষি নারদের হৃদয়ে শোকাবেগ উপস্থিত হইয়াছে।

অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে বই কি।" (নারদ) "আপনি তাহাই আমাকে বলুন।"

বাগ্‌ বাব নাম্নো ভূয়সী বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং—দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্চ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চ যদ্বৈ বাঙ্‌নাভবিষ্যন্ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচ-মুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২।১

"নাম হইতে বাক্ শ্রেষ্ঠতর[১]। ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণাদি পঞ্চম বেদ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, নৈসর্গিক বিদ্যা, নিধি-বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, জড়বিজ্ঞান, ধনুর্বিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র, দেবলোক, ভূলোক, আকাশ, জল, তেজ, দেববৃন্দ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষীগণ, তৃণ ও বনস্পতি প্রভৃতি, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা সহ হিংস্র জন্তুগণ, পুণ্য ও পাপ, সত্য ও মিথ্যা, শুভ ও অশুভ, মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ প্রভৃতি

১। বাগিন্দ্রিয় বর্ণোচ্চারণের কারণ; কার্য অপেক্ষা কারণ শ্রেষ্ঠ হয়।

সকলই বাক্-এর দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়। বাক্ না থাকিলে ধর্ম ও অধর্ম বিজ্ঞাপিত হইত না; সত্য বা মিথ্যা, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ কিছুই প্রকাশিত হইত না। বাক্ এই সমস্তই জানাইয়া দেয়। বাক্-এর উপাসনা কর।"

স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২।২

"ব্রহ্মবুদ্ধিতে যিনি বাক্-এর উপাসনা করেন যতদূর বাক্-এর গতি ততদূর পর্যন্ত তাঁহার স্বচ্ছন্দ গতি হইয়া থাকে।" (নারদ) "ভগবন্, বাক্ হইতে কি শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে?" (সনৎকুমার) "বাক্ হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে।" (নারদ) "আপনি উহা আমাকে বলুন।"

মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাঽক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচং চ নাম চ মনোঽনুভবতি স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে কর্মাণি কুর্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছথ ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছে-য়েত্যথেচ্ছতে মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৩।১

"বাক্-ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।[১] হস্তমুষ্টি মধ্যে যেরূপ

১। আগে চিন্তা, পরে বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার; অতএব মন শ্রেষ্ঠ।

দুইটি আমলকী অথবা দুইটি বদরী, কিম্বা দুইটি অক্ষফল (বহেড়া) ধৃত হয়, সেরূপ মনও বাক্ এবং নামকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখে। যখন কেহ মনে মনে এরূপ চিন্তা করে যে 'মন্ত্র পাঠ করি,' তখন সে মন্ত্র পাঠ করে। যখন এইরূপ চিন্তা করে যে 'কর্ম করি,' তখন সে কর্ম করে। যখন এরূপ ভাবে যে 'পুত্র ও পশু কামনা করি,' তখন সে তাহাই লাভ করে। যখন মনে করে, 'ইহলোক ও পরলোক লাভ করিব,' তখন সে তাহা লাভ করে। মনই আত্মা, মনই লোক, মনই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মবুদ্ধিতে মনের উপাসনা কর।"

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৩।২

"মনকে যে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে তাহার মনের যতদূর গতি ততদূর পর্যন্ত যথেচ্ছ গতি হয়।" (নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন) "হে ভগবন্, মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?" (সনৎকুমার কহিলেন) "মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ) "উহা আপনি আমাকে বলুন।"

সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৪।১

"মন অপেক্ষা সঙ্কল্প মহত্তর। লোক প্রথম সঙ্কল্প করে, পরে চিন্তা করে; তারপর বাক্ পরিচালিত হয়। শেষে বাক্‌কে নামোচ্চারণে নিযুক্ত করে। মন্ত্রসকল নামে এবং কর্মসকল মন্ত্রে একীভূত হয়।"

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লৃপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে বর্ষস্য সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ কর্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্মণাং সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সঙ্‌ক্লৃপ্ত্যৈ সর্বং সঙ্কল্পতে স এষ সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৪।২

"এই সকলেরই একমাত্র গতি সঙ্কল্প। সঙ্কল্পই ইহাদের উপাদান, এবং ইহারা সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত। দ্যুলোক ও ভূলোক, বায়ু ও আকাশ, জল ও তেজ (যেন) সঙ্কল্প করিয়াছে।[১] ইহাদের সঙ্কল্পবশতঃ বৃষ্টি সঙ্কল্প করে; বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্ন সঙ্কল্প করে; অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণ সংকল্প করে; প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্র সঙ্কল্প করে; মন্ত্রের সঙ্কল্পে কর্ম সঙ্কল্প করে; কর্মের সঙ্কল্পে ফল সঙ্কল্প করে; কর্মফলের সঙ্কল্পে জগৎ সঙ্কল্প করে। এই সঙ্কল্প এপ্রকার। তুমি সঙ্কল্পের উপাসক হও।"

১। কেবল পূর্বোক্ত সমস্তের কারণ বলিয়াই যে সঙ্কল্প মহৎ তাহাই নহে; দ্যুলোক প্রভৃতি মহৎদিগের অন্তরে উহার স্থান আছে বলিয়াও উহা মহৎ।

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেক্লৃপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্। প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যু-পাস্তেঽস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্ ভূয় ইতি সঙ্কল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৪।৩

"যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে সঙ্কল্প উপাসনা করেন তিনি সঙ্কল্পিত লোকসকল, (অর্থাৎ নিজে) ধ্রুব হইয়া (আপেক্ষিক) ধ্রুব লোকসকল, প্রতিষ্ঠাবান হইয়া প্রতিষ্ঠাযুক্ত লোকসমূহ এবং ব্যথাশূন্য হইয়া ব্যথাহীন লোকসমূহ লাভ করেন। যিনি ব্রহ্মরূপে সঙ্কল্প-উপাসনা করেন যতদূর (তাঁহার নিজের) সঙ্কল্পের গতি, ততদূর পর্যন্ত তিনি স্বচ্ছন্দগতি হন।" (নারদ বলিলেন) "হে ভগবন্, সঙ্কল্প অপেক্ষা মহত্তর কি কিছু আছে?" (সনৎকুমার) "অবশ্যই সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।" (নারদ) "উহা আপনি আমাকে বলুন।"[১]

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৫।১

১। এখানে সঙ্কল্পস্য গতম্ এই শ্রুতির অর্থ কেবল উপাসকেরই সঙ্কল্প—যেকোন লোকের যেকোন বিষয়ের সঙ্কল্প নহে। কারণ পরবর্তী পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় শ্রুতিতে 'যাবৎ চিত্তস্য গতম্' এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ, চিত্তের যাহা কিছু বিষয় তাহাই

"সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত মহত্তর। কারণ যখন কোন বিষয়ে কেহ সচেতন হয় সে তখন সঙ্কল্প করে, পরে চিন্তা করে। চিন্তার পর বাক্‌কে পরিচালিত করে। পরে বাক্‌কে নামোচ্চারণে নিযুক্ত করে। মন্ত্রসকল নামে এবং কর্মসকল মন্ত্রে একীভূত হয়।"

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্ যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈন-মাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিত্যথ যদ্যল্পবিচ্চিত্ত-বান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে চিত্তং হ্যেবৈষামেকায়নং চিত্ত-মাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৫।২

"সঙ্কল্পাদি সবই চিত্তে লীন হয়। চিত্তই ইহাদের উদ্ভবস্থল, এবং তাহারা চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি কেহ নির্বোধ হন তবে লোকে তাঁহাকে বলে, ইনি থাকিয়াও নাই। ইঁহার বিদ্যা বৃথা ; কারণ যথার্থ বিদ্বান হইলে এরূপ নির্বোধ হইতেন না। পক্ষান্তরে অল্পবিদ্বান ব্যক্তিও যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে লোকে তাহার কথা আগ্রহ সহকারে শুনিয়া থাকে। ইহাদের সকলের গতি চিত্ত। ইহাদের স্বরূপ চিত্ত এবং ইহাদের প্রতিষ্ঠা চিত্তে। চিত্ত-উপাসনা কর।"

স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে চিত্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবচ্চি-

---

বুঝিতে হইবে। সুতরাং এখানে সাধারণ লোকের সঙ্কল্পের কথা উল্লেখ করিলে পরবর্তী ঐ শ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ত্তস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৫।৩

"যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে চিত্তের উপাসনা করেন তিনি সুবুদ্ধিসুলভ গুণসমূহে সুসমৃদ্ধ লোক সমূহ, অর্থাৎ নিজে ধ্রুব হইয়াও ধ্রুবলোক সকল, প্রতিষ্ঠাবান হইয়া প্রতিষ্ঠাযুক্ত লোকসমূহ এবং ব্যথাশূন্য হইয়া ব্যথাহীন লোকসমূহ লাভ করেন। চিত্তকে যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন, চিত্তের গতি যতদূর হয় তাঁহারও ততদূর স্বচ্ছন্দ গতি হইয়া থাকে।" (নারদ) "হে ভগবন্, চিত্ত অপেক্ষা মহত্তর কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার) "অবশ্যই চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু আছে।" (নারদ) "আপনি আমাকে তাহা বলুন।"

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাস্তস্মাদ্ য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যে অল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তেঽথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৬।১

"চিত্ত হইতেও ধ্যান গরীয়ান। পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, অন্তরীক্ষ যেন ধ্যান করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যানমগ্ন, জল যেন ধ্যানে স্থির, পর্বতসমূহ যেন ধ্যান-গম্ভীর; দেবগণ তথা মনুষ্যগণও যেন

ধ্যাননিমগ্ন। এই হেতু ইহলোকে মানবগণের মধ্যে যাঁহারা মহৎ হন তাঁহারা যেন ধ্যানের ফলেই ঐরূপ হন। আর যাহারা ক্ষুদ্র, তাহারা কলহপ্রিয়, পরদোষান্বেষী ও নিন্দুক হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা মহদ্‌গুণ-সম্পন্ন তাঁহারা ধ্যান-ফলের অংশভাগী। ধ্যান-উপাসনা কর।"

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো ধ্যানাদ্‌ ভূয় ইতি ধ্যানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্‌ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৬।২

"যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে ধ্যানের উপাসনা করেন, যতদূর ধ্যানের গতি তাঁহারও ততদূর স্বচ্ছন্দ গতি হয়।" (নারদ) "হে ভগবন্‌, ধ্যান অপেক্ষা মহৎ কি কিছু আছে?" (সনৎকুমার) "ধ্যান হইতেও মহত্তর বস্তু আছে।" (নারদ) "আপনি আমাকে উহা বলুন।"[১]

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং

১। ধ্যান সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে যে প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌, অর্থাৎ কোন একটি অভিমত বিষয়ে অনবরত চিত্তের একাকার প্রবাহই ধ্যান। সেখানে লক্ষণীয় এই যে ধ্যানের জন্য যেই বিষয়টি অবলম্বন করিতে হইবে সেই বিষয়টি যেমন মনোরম হওয়া প্রয়োজন তেমনই আবার শাস্ত্রোক্ত হওয়া প্রয়োজন। যাহা শাস্ত্রোক্ত হইয়াও মনের প্রিয় না হয়, অথবা মনোরম হইয়াও শাস্ত্রোক্ত না হয় তাহা ধ্যানের উপযুক্ত আলম্বন নহে।

দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চান্নং চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৭।১

"বিজ্ঞান (শাস্ত্রার্থবোধ) ধ্যান হইতে মহত্তর।[১] বিজ্ঞানের ফলে ঋগবেদ্ অবগত হয় ; যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, নৈসর্গিকবিদ্যা, নিধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, জড়-বিজ্ঞান, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, নাগবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র, দেবলোক, ভূলোক, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেববৃন্দ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকাসহ হিংস্রজন্তুগণ, ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য, শুভ ও অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ, অন্ন ও স্বাদ, ইহলোক ও পরলোক বিজ্ঞান-সহায়েই জানা হয়। বিজ্ঞান-উপাসনা কর।"

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকাঞ্জ্ঞানবতোঽভিসিধ্যতি যাবদ্ বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৭।২

১। মানুষ শাস্ত্রার্থদৃষ্টি সহায়ে প্রামাণিকরূপে জানিতে পারে যে ঋগাদি কোন্ মন্ত্রের অর্থ কিরূপ। তখন সে তদনুযায়ী ধ্যানে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বিজ্ঞান ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"যিনি ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে বিজ্ঞানের উপাসনা করেন তিনি বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীগণের লোকসকল লাভ করেন। বিজ্ঞানের যতদূর গতি তিনিও ততদূর পর্যন্ত স্বচ্ছন্দগতি হন।" (নারদ) "হে ভগবন্, বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?" (সনৎকুমার) "অবশ্যই বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।" (নারদ) "আপনি আমাকে উহা বলুন।"

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৮।১

"বিজ্ঞান হইতে বল শ্রেষ্ঠতর। একজন বলবান ব্যক্তি একশত জন বিজ্ঞানীকে কম্পিত করে। যখন কেহ বলবান হয়, তখন সে উঠিতে সমর্থ হয়; উঠিতে সমর্থ হইয়া শুশ্রূষা করে; শুশ্রূষা করিয়া অন্তরঙ্গ হয়; অন্তরঙ্গ হইয়া পর্যবেক্ষণ করে, শ্রবণ করে, মনন করে, ধারণা করে, আচরণ করে; আচরণের ফলে অনুভব করে পৃথিবী বলের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বলের দ্বারাই অন্তরীক্ষ, দেবলোক, পর্বত, দেবমানবগণ, পশুগণ, পক্ষিসমূহ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা সহ হিংস্র পশুগণ এবং লোক সুপ্রতিষ্ঠিত। বলের উপাসনা কর।"

স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ বলস্য গতং তত্রাস্য যথা-কামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বলাদ্ভূয় ইতি বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৮।২

"যিনিই ব্রহ্মবুদ্ধিতে বলের উপাসনা করেন, যতদূর বলের গতি ততদূর পর্যন্ত তিনিও স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করেন।" (নারদ) "হে ভগবন্, বল হইতে শ্রেষ্ঠতর কি কিছু আছে?" (সনৎকুমার) "বল অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠতর বস্তু আছে।" (নারদ) "আপনি উহা আমাকে বলুন।"

অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্ যদ্যু হ জীবেদথবাঽদ্রষ্টাঽশ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্তাঽবিজ্ঞাতা ভবত্যথান্ন-স্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৯।১

"বল হইতে অন্ন শ্রেষ্ঠ। এইজন্য কেহ যদি দশ দিন অনাহারে থাকে তবে সে জীবিত থাকিলেও দৃষ্টিহীন, শ্রবণহীন, মননহীন, বোধহীন, ক্রিয়াহীন ও বিজ্ঞানহীন হয়। পরে অন্ন গ্রহণ করিলে সে পুনরায় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা এবং বিজ্ঞাতা হয়। অন্ন-উপাসনা কর।"

স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পান-বতোঽভিসিধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি

যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইত্যন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।৯।২

"ব্রহ্মবুদ্ধিতে যিনি অন্নের উপাসনা করেন, তিনি প্রভূত অন্নপান-যুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন। যতদূর অন্নের গতি, ততদূর তাঁহারও স্বচ্ছন্দ গতি হয়।" (নারদ) "হে ভগবন্, অন্ন হইতে কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?" (সনৎকুমার) "অবশ্যই অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।" (নারদ) "আপনি উহা আমাকে বলুন।"

আপো বাব অন্নাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীত্যথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাপ এবেমা মূর্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্ দ্যৌর্যৎ পর্বতা যদ্দেবমনুষ্যা যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ এবেমা মূর্তা অপ উপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১০।১

"জল অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ। এইজন্য যখনই সুবৃষ্টি না হয় তখনই 'অন্নের অভাব হইবে' এই চিন্তায় প্রাণীসমূহ উদ্বিগ্ন হয়। আবার সুবৃষ্টি হইলে 'যথেষ্ট অন্ন হইবে' ইহা মনে করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হয়। আকার-বিশিষ্ট যাহা কিছু—এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দেবলোক, পর্বত-সমূহ, দেবগণ, মনুষ্যসকল, পশুগণ, পক্ষিসমূহ, তৃণ-বনস্পতিসকল এবং কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকা সহ হিংস্রজন্তুগণ—জলই তৎসমুদয়রূপে পরিণত হইয়াছে। জলের উপাসনা কর।"

স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আপ্নোতি সর্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইত্যদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১০।২

"যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে জলের উপাসনা করেন তিনি সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং তৃপ্ত হন। যতদূর জলের গতি তাঁহারও ততদূর স্বচ্ছন্দ গতি হয়।" (নারদ) "হে ভগবন্, জল হইতে উন্নত কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার) "জল হইতে উন্নত বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ) "আপনি আমাকে তাহা বলুন।"

তেজো বাবাদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভিতপতি তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্ধ্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভি-রাহ্রাদাশ্চরন্তি তস্মাদাহুর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১১।১

"জল অপেক্ষা তেজ গরীয়ান। এই তেজ যখন বায়ুকে অবলম্বন করিয়া আকাশকে সন্তপ্ত করে তখন লোকে বলে—'অত্যন্ত গরম, দগ্ধ করিতেছে, বৃষ্টি হইবে।' এইরূপ স্থলে তেজ অগ্রে নিজেকে প্রকাশ করিয়া পরে জল সৃষ্টি করে। উর্ধ্বগামী ও তির্যক্‌গামী বিদ্যুতের সহিত যখন মেঘ-সমূহ ভ্রমণ করিতে থাকে তাহাও এই তেজেরই ক্রিয়া। এইজন্য বলা হইয়া থাকে যে, 'বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ গর্জন

করিতেছে, বৃষ্টি হইবে।' (অতএব) তেজ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়া পরে জল সৃজন করে। তেজের উপাসনা কর।”

স যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিধ্যতি যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১১।২

“যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে তেজের উপাসনা করেন তিনি তেজস্বী হন; তিনি দীপ্তিমান উজ্জ্বল তমোহীন লোকসকল লাভ করেন। যতদূর তেজের গতি, তিনিও ততদূর পর্যন্ত স্বচ্ছন্দগতি হন।” (নারদ) “হে ভগবন্, তেজ অপেক্ষা মহত্তর কিছু আছে কি? (সনৎকুমার) “অবশ্যই তেজ অপেক্ষা মহত্তর বস্তু আছে।” (নারদ) “আপনি তাহা আমাকে বলুন।”

আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতি-শৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশ-মভিজায়ত আকাশমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১২।১

“তেজ অপেক্ষা আকাশ মহত্তর। চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ে, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রসমূহ এবং অগ্নি আকাশে বিদ্যমান। আকাশের সাহায্যে আহ্বান, শ্রবণ, প্রতিশ্রবণ করা হয়। পরস্পরের ক্রীড়া আকাশে হয়।

(বিয়োগজনিত) শোক আকাশে অনুভূত হয়। অঙ্কুরাদি আকাশে জন্মায়, আকাশ অভিমুখে উদ্গত হয়। আকাশের উপাসনা কর।"

স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আকাশবতো বৈ স লোকান্ প্রকাশবতোঽসংবাধানুরুগায়বতোঽভিসিধ্যতি যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আকাশাদ্ভূয় ইত্যাকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১২।২

"ব্রহ্মবুদ্ধিতে যিনি আকাশের উপাসনা করেন তিনি সুবিস্তীর্ণ, জ্যোতির্ময়, ক্লেশহীন, বিশাল লোকসমূহ লাভ করেন। আকাশ যতদূর বিস্তৃত ততদূর পর্যন্ত তাঁহার স্বচ্ছন্দ গতি লাভ হয়।" (নারদ) "হে ভগবন্, আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কি কিছু আছে?" (সনৎকুমার) "আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু নিশ্চয়ই আছে।" (নারদ) "তাহা আমাকে বলুন।"

স্মরো বাবাকাশাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি বহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্ যদা বাব তে স্মরেয়ুরথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ স্মরমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৩।১

"স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এইজন্যই বহুলোকের সমাগম হইলেও স্মৃতি না থাকিলে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না, চিন্তা

করিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। আবার যখন স্মৃতি লাভ হয় তখন শুনিতে পায়, চিন্তা করে ও বুঝিতে পারে। স্মৃতির সাহায্যেই পশুগণকে চিনিতে পারে। স্মৃতির উপাসনা কর।”

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ভূয় ইতি স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৩।২

“স্মৃতিকে যিনি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, স্মৃতির যতদূর গতি তিনিও ততদূর স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করেন।” (নারদ) “হে ভগবন্, স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?” (সনৎকুমার) “স্মৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে।” (নারদ) “আপনি তাহা আমাকে বলুন।”[১]

আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছত আশামুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৪।১

---

১ ভোগমাত্রই স্মরণশক্তির অধীন। যাহার চিত্তে ভোগের কোন সংস্কার নাই, তাহার ভোগবিষয়ে কোন অনুভবই নাই ইহা বুঝিতে পারা যায়। অভিজ্ঞতা না থাকিলে সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মে না। সুতরাং ঐরূপ মানব কখনও ভোগক্ষম হইতে পারে না। ভোগ্যবস্তু বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে উহা গ্রহণীয় বলিয়া বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। সুতরাং পূর্বে ভোগের অনুভব থাকিলে ঐ অনুভবজনিত সংস্কার অন্তঃকরণে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ভোগ্যবস্তুর সান্নিধ্যে সেই সংস্কার পুনঃ প্রবুদ্ধ হইয়া স্মৃতিরূপে পরিণতি লাভ করে এবং তাহারই ফলে সংস্কারানুরূপ ভোগে প্রবৃত্তি জন্মে।

"স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠতর। আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই স্মৃতিমান পুরুষ মন্ত্রসমূহ পাঠ করেন, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি কামনা করেন এবং ইহলোক ও পরলোকের বাঞ্ছা করেন।"

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আশয়াঽস্য সর্বে কামাঃ সমৃধ্যন্ত্য-মোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইত্যাশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৪।২

"যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে আশার উপাসনা করেন, তাঁহার সকল বাসনা আশা দ্বারা পরিপুষ্ট হয় (অর্থাৎ পূর্ণ হয়) এবং তাঁহার প্রার্থনা সমূহ অব্যর্থ হয়। যতদূর আশার গতি তাঁহারও স্বচ্ছন্দ গতি ততদূর হয়।" (নারদ) "হে ভগবন্, আশা অপেক্ষা মহত্তর কি কিছু আছে ?" (সনৎকুমার) "আশা অপেক্ষা মহত্তর বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ) "আপনি উহা আমাকে বলুন।"

প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৫।১

"আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠতর। শলাকাসমূহ যেমন রথনাভিতে সংযুক্ত থাকে সেরূপ সমস্তই প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রাণের

দ্বারাই প্রাণ বিচরণ করে। প্রাণই প্রাণকে প্রাণ দান করে; প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য এবং ব্রাহ্মণ।"[১]

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বাঽস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৫।২

"যদি কেহ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য বা ব্রাহ্মণকে কিছু রূঢ় কথা বলে তবে তাহাকে লোকে বলে, 'তোমায় ধিক্, তুমি পিতৃঘাতী হইয়াছ, মাতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, ভগিনীঘাতী, গুরুঘ্ন, ব্রাহ্মণঘ্ন হইয়াছ।"

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিষন্দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাঽসীতি ন মাতৃহাঽসীতি ন ভ্রাতৃহাঽসীতি ন স্বসৃহাঽসীতি নাচার্যহাঽসীতি ন ব্রাহ্মণহাঽসীতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৫।৩

১। নাম হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর যে কয়টি বিষয়কে 'ভূয়ান্' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথমটি কার্যস্বরূপ, দ্বিতীয়টি কারণস্বরূপ। আশা পর্যন্তই এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। নাম কার্য, বাক্ তাহার কারণ; বাক্ কার্য মন তাহার কারণ, ইত্যাদি। সর্বত্র কার্য অপেক্ষা কারণ মহৎ হয়—ইহাই স্বাভাবিক। অতএব নাম প্রভৃতি কার্য অপেক্ষা তাহার কারণ স্বরূপ বাক্ প্রভৃতিকে 'ভূয়ান্' রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে নাম হইতে আশা পর্যন্ত যে কয়টি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সবই আশার অধীন—অভিলাষের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এইজন্যই তাহাদিগকে আশাপাশে বদ্ধ বলা হইয়াছে। স্মৃতিশক্তি ঐ সকলের কার্যকারিতার মূল। কারণ স্মরণাভাবে উহাদের কোনরূপ কার্য করা সম্ভব নহে।

"পক্ষান্তরে ইহাদিগের মৃত শরীর পুঞ্জীভূত করিয়া যদি কেহ শূলদ্বারা খণ্ডখণ্ড করিয়াও দাহ করে তথাপি লোকে কখনও তাহাকে ইহা বলে না যে 'তুমি পিতৃঘাতী হইয়াছ, মাতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, ভগিনীঘাতী, গুরুঘ্ন বা ব্রাহ্মণঘ্ন হইয়াছ।' "

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি তং চেদ্ ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতি-বাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৫।৪

"প্রাণই এই সমস্ত—পিতা মাতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই প্রাণতত্ত্ব যিনি জানেন তিনি এইরূপ অনুভব করিয়া, বিচার করিয়া, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধবাক্ হন। কেহ যদি তাঁহাকে বলে, 'আপনি অতিবাদী'[১], তবে তিনি বলিয়া থাকেন, 'হাঁ, আমি অতিবাদী' —তাঁহার অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।"

এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৬।১

১। 'অতি' শব্দের অর্থ অধিক বা অতিরিক্ত; 'বাদী' শব্দের অর্থ বক্তা। অতএব যিনি অতিরিক্ত বলিতে পারেন তাঁহাকেই 'অতিবাদী' বলা যাইতে পারে। প্রাণতত্ত্বজ্ঞ সাধক নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্যন্ত যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা তো সম্পূর্ণ জানেনই; অধিকন্তু প্রাণরূপে আত্মতত্ত্বও জানেন। এইজন্যই আশার অতীত প্রাণের গূঢ় রহস্য বলিতে তিনি সমর্থ। ইহার পরবর্তী শ্রুতিতে যথার্থ অতিবাদী কাহাকে বলে তাহা আরও বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

"সত্যকে আশ্রয় করিয়া যিনি সিদ্ধবাক্ হন, তিনিই যথার্থ সিদ্ধবাক্।" (নারদ) "আমি যেন সত্যাবলম্বনেই সিদ্ধবাক্ হই।" (সনৎকুমার) "যদি তাহা চাও, তাহা হইলে কিন্তু সত্যকেই জানিবার জন্য আগ্রহশীল হইতে হইবে।" (নারদ) "হে ভগবন্, আমি সত্যকেই উত্তমরূপে জানিতে চাই।"

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৭।১

"যখন কেহ বিশেষ জ্ঞানবান্ হন, তখন তিনি সত্য বলিয়া থাকেন। সম্পূর্ণ না জানিয়া কেহ সত্য প্রকাশ করিতে পারেন না। বিশেষভাবে জানিয়াই সত্য বলিতে পারা যায়। এই বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিতে সমুৎসুক হওয়া আবশ্যক।" (নারদ) "হে ভগবন্, আমি বিশেষভাবে বিজ্ঞান লাভ করিতে চাই।"[১]

যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৮।১

১। বস্তুর যাহা সাধারণ জ্ঞান তাহা বিজ্ঞানপদবাচ্য নহে। বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। বস্তুর বিশেষ অবস্থা সম্যক্‌রূপে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে অনুভূত হয়। সুতরাং অপরোক্ষানুভূতি এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ। অদ্বৈতবেদান্তমতে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। নামরূপাত্মক দৃশ্যমান প্রপঞ্চ সত্য নহে। উহা মিথ্যা। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর নামরূপবিমুক্ত স্বরূপের অপরোক্ষ উপলব্ধি এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ। নারদ ঐরূপ বিজ্ঞান জানিতেই অভিলাষী হইয়াছিলেন।

"কেহ যখন মনন করেন তখন বিজ্ঞানলাভ করেন। মনন ব্যতিরেকে বিজ্ঞানলাভ হইতে পারে না, মনন করাতেই বিজ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। কিন্তু মনন কি তাহা জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসা প্রয়োজন।" (নারদ) "হে ভগবন্, আমি মনন কি তাহা জানিতে চাহি।"

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।১৯।১

"কেহ যখন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন তখনই তিনি মনন করিতে পারেন। শ্রদ্ধাবান্ না হইয়া মনন করা যায় না। শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই মনন করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা কি তাহা জানিতে চেষ্টা করা উচিত।" (নারদ) "হে ভগবন্, শ্রদ্ধা কি তাহা আমি জানিতে চাই।"

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২০।১

"যখনই কেহ নিষ্ঠাবান্ হন তখনই তিনি শ্রদ্ধাবান্ও হন। নিষ্ঠাযুক্ত না হইলে কেহ শ্রদ্ধাযুক্ত হন না। নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। নিষ্ঠা কি তাহা জানিতে সমুৎসুক হওয়া প্রয়োজন।" (নারদ) "হে ভগবন্, আমি নিষ্ঠা কি তাহা জানিতে চাই।"

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২১।১

"একাগ্র ব্যক্তিই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন। একাগ্র না হইলে নিষ্ঠাবান্ হওয়া যায় না। একাগ্র হইলেই নিষ্ঠাবান্ হওয়া যায়। একাগ্রতা কি তাহা জানিতে সমুৎসুক হওয়া প্রয়োজন।" (নারদ) "হে ভগবন্, একাগ্রতা কি তাহা আমি জানিতে চাই।"

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২২।১

"যখন কেহ সুখলাভ করে তখন সে একাগ্রতা সাধন করে। সুখ-লাভ না করিলে একাগ্রতা সাধনে প্রবৃত্তি হয় না। সুখলাভ করিয়াই লোক একাগ্রতা সাধনে অগ্রসর হয়।[১] এই সুখ কি তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রয়োজন।" (নারদ) "হে ভগবন্, সুখ কি তাহা আমি জানিতে চাই।"

১। ইন্দ্রিয়-সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে যে আনন্দ লাভ হয় উহা স্থির এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের ফলে মন স্বভাবতঃই বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং ঐ অবস্থায় যে সুখানুভূতি হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযমের প্রভাবে মন নিশ্চল হইলে বিষয়-সংস্পর্শ ব্যতিরেকেই যে পরমানন্দ লাভ হয় উহা একান্তভাবে আত্ম-কেন্দ্রিক। সুতরাং ঐ আনন্দ সর্বদাই প্রদীপ্ত থাকে।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২৩।১

"যাহা ভূমা তাহাই সুখ। ক্ষুদ্রে সুখ নাই। ভূমাই[১] সুখ। ভূমা কি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে হইবে" (নারদ) "হে ভগবন্, ভূমা কি তাহা আমি জানিতে চাই।"

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২৪।১

১। ভূমা শব্দের অর্থ মহৎ বা বৃহৎ ; সুতরাং যাহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্থাৎ অসীম, তাহাই ভূমা। এই অর্থেই ব্রহ্মকে ভূমা বলা হইয়াছে। বৃহ্ শব্দ হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি ও বৃহৎ। 'সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্পষ্ট নির্দেশ করা হইয়াছে। এইজন্য ভূমাস্বরূপ ব্রহ্মকে সুখরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহা কোন কাল বা দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ, তাহার অপেক্ষা আরও বৃহৎ আছে ইহা স্বভাবতঃই বুঝা যায়, সুতরাং কোন সসীম বস্তুর প্রাপ্তি কখনও পরমানন্দদায়ক হইতে পারে না। কারণ বস্তুর সসীমত্ব আপেক্ষিক। অতএব যাহা লাভ করা যায় তদপেক্ষা অধিক সুখদায়ক কিছু দেখিলেই পুনরায় তাহা পাইবার অভিলাষ জন্মে ; এবং তাহা লাভ করিলেও তদপেক্ষা অধিক কিছু পাইবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে। এইভাবে উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়াই অল্প বা সসীম বস্তুতে প্রকৃত সুখ নাই।

"যে অবস্থায় কেহ অপর কাহাকেও দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না,[১] উহাই ভূমা ; আর যে অবস্থায় অপর কিছু দেখে, অপর কিছু শোনে, অপর কিছু জানে—তাহাই ক্ষুদ্র। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত। আর যাহা ক্ষুদ্র তাহাই মরণধর্মী।" (নারদ) "হে ভগবন্, তিনি কোথায় অবস্থিত ?" (সনৎকুমার) "আত্মমহিমায়, অথবা তাহাতেও নহে।"

গো-অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্যং ক্ষেত্রা-ণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২৪।২

"জগতে গো, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণ, দাস, ভার্যা, ক্ষেত্র, গৃহ প্রভৃতিকেই মহিমা বলা হইয়া থাকে। আমি কিন্তু এইপ্রকার মহিমার কথা বলিতেছি না। কারণ, প্রতিষ্ঠা বলিতে বুঝায় একের অন্যের উপর স্থিতি। আমি বলিতেছি—"

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদ-হমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতো-ঽহমেবেদং সর্বমিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২৫।১

১। অবিদ্যাবস্থায় দ্বৈতের দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান হয়। ভূমাতে এই দ্বৈত নাই, সুতরাং তাদৃশ দর্শনাদিও নাই।

"তিনি নিম্নে, তিনি উর্দ্ধে, তিনি পশ্চাদ্দেশে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে,—এই সমস্তই তিনি। অতঃপর 'আমি' পূর্বক এই উপদেশ। আমি অধোভাগে, আমি উর্দ্ধে, আমি পশ্চাদ্ভাগে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে। এই সমস্তই আমি। (অর্থাৎ ভূমাই আমি।)"

অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবত্যথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি॥

ছান্দোগ্য ৭৷২৫৷২

"অতঃপর আত্মা অবলম্বনে উপদেশ করা হইতেছে। আত্মাই নিম্নে, আত্মা উর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাদ্দেশে, আত্মা সম্মুখভাগে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে। এই সমস্তই আত্মা। এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ বিজ্ঞানলাভ করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মারাম, আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মানন্দ হইয়া সর্বেশ্বর হন। সকল লোকে তাঁহার অপ্রতিহত গতি হয়। আর ইহা ভিন্ন অন্যরূপ যাহারা জানে তাহারা অন্য রাজার অধীন মরণশীল লোকবাসী হয়। তাহারা সকল লোকে অপ্রতিহত গতি লাভ করে না।"

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত

আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্বমিতি ॥

ছান্দোগ্য ৭।২৬।১

"যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করেন, এইরূপ অনুভব করেন, এইরূপ জানেন, তিনি দেখেন যে আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, স্মৃতি, আকাশ, তেজ, জল, উৎপত্তি ও বিলয়, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মন্ত্রসকল, সমুদয় কর্ম, এবং আত্মা হইতেই এই সমস্তই হইয়া থাকে।"

তদেষ শ্লোকো
ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥ ইতি।

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিরাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে ॥

ছান্দোগ্য ৭।২৬।২

"এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে। 'তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে মৃত্যু

নাই, ব্যাধি নাই, দুঃখও নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্তই প্রকাশ পায় এবং তিনি সর্বপ্রকারে সমস্তই লাভ করিয়া থাকেন।' তিনি (সৃষ্টির পূর্বে) অদ্বিতীয়রূপে বিদ্যমান থাকেন ; (পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে) তিন প্রকার, পঞ্চ প্রকার, সপ্ত প্রকার, নব প্রকার হন। পুনরায় তাঁহাকে একাদশ, একশত দশ এবং এক হাজার বিশ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আহারশুদ্ধি[১] হইতে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধি হইতে অচলা স্মৃতি হয়। অচলা স্মৃতি লাভ হইলে সকল পাশ বিনষ্ট হয়।"

ভগবান সনৎকুমার রাগাদিদোষমুক্ত নারদকে অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন। সনৎকুমারকে স্কন্দ বলা হয়।[২]

১। "আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ"—যাহা আহরণ করা হয় তাহাই আহার। ভোক্তা নিজের ভোগের জন্য শব্দাদি বিষয় আহরণ করেন—সুতরাং এই সমস্তই তাঁহার আহার। এতাদৃশ বিষয়ের উপলব্ধি করা-রূপ যে জ্ঞান, তাহার শুদ্ধিকেই আহারশুদ্ধি বলা হইয়াছে। অতএব আহারশুদ্ধি=রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি দোষ হইতে নির্মুক্ত বিষয়োপলব্ধি।

২। নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথনের মাধ্যমে এই সপ্তম অধ্যায় বিবৃত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ নিজে নানা বিদ্যাবিশারদ এবং বংশগৌরবশালী, তথাপি ইহলৌকিক ভোগের পরিপূর্ণ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে নিজের অকৃতার্থতা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান সনৎকুমারের নিকট শিষ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই অধ্যায়ের মাধ্যমে উপনিষদ্ ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন যে সমস্ত জাগতিক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেও জড়বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ পরমানন্দময় শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কেবলমাত্র চৈতন্যময় ভূমাস্বরূপ বস্তুকে অবগত হইলেই অন্তরের সমস্ত তৃষ্ণা চিরতরে নিঃশেষিত হইয়া যায়। সসীম বস্তু লাভের দ্বারা ঐরূপ আনন্দ কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং জীবনের যাহা চরম ও পরম লক্ষ্য সে দুঃখের চিরনিবৃত্তি ও সুখলাভের জন্য সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতার সাহায্যে সদ্গুরুর উপদেশ অনুসারে পরমলক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে।

সৃষ্টি

পরিদৃশ্যমান এই জীবজগতের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই জন্যই অনাদিকাল হইতে মনীষীবৃন্দ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সৃষ্টিরহস্যের মূল অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অসৎ বা শূন্যকেই কেহ কেহ জগতের মূল কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু অথবা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণাত্মক প্রকৃতিকেই কোন কোন দার্শনিক জগতের মূল কারণরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদ্ নিত্য শুদ্ধ বিরাট ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে॥ ইতি

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে-ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽ-ভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য॥

তৈত্তিরীয় ২।৭

সৃষ্টির পূর্বে এই জগতের কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহা (ব্রহ্ম) হইতে পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি (ব্রহ্ম) নিজেকে নিজেই এইরূপ করিলেন। এইজন্য তাঁহাকে বলা হয় আত্মকৃত।

যিনি সেই আত্মকর্তা তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপকে লাভ করিয়া জীব আনন্দময় হয়। হৃদয়াকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ না থাকিলে কেই বা অপান-ক্রিয়া করিত আর কেই বা প্রাণ-ক্রিয়া করিত? (ব্রহ্ম আছেনই, কারণ) কেবল তিনিই আনন্দিত করেন। যখনই এই দর্শনাতীত, অশরীরী, অনির্বচনীয়, আশ্রয়হীন বস্তুকে অভয়ের একমাত্র অবস্থানরূপে জানা যায় তখনই সাধক অভয়প্রাপ্ত হয়। আর যখন ইহাতে কিছুমাত্র ভেদবুদ্ধি উদয় হয় তখনই ভয়ের উদয় হয়। অবিবেকী সাধারণ জ্ঞানীর পক্ষে এই অভয় পদই আবার ভয়ের কারণ।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

মুণ্ডক ১।১।৭

উর্ণনাভ যেরূপ তন্তু উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, ভূপৃষ্ঠে যেরূপ লতাগুল্মাদি উৎপন্ন হয়, মনুষ্যদেহে যেরূপ কেশ ও লোম সমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপই ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াঽশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। সোঽর্চন্নচরৎ তস্যার্চত আপোঽজায়ন্তার্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বং কং হ বা অস্মৈ ভবতি য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ॥

বৃহদারণ্যক ১।২।১

৮

পূর্বে কোথাও কিছুই ছিল না ; বুভুক্ষারূপ মৃত্যুর দ্বারা সকলই আবৃত ছিল,[১] কারণ ক্ষুধাই মৃত্যু। "আমি আত্মবান্ হইব," এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঐ মৃত্যু মনের সৃষ্টি করিলেন। সেই মন নিজেকে অর্চনা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্চনাকালে জল উৎপন্ন হইল।[২] (তিনি চিন্তা করিলেন) "আমার তপস্যা কালে 'ক' অর্থাৎ উদক উৎপন্ন হইল।" অতএব ইহাই অগ্নির অগ্নিত্ব। যিনি এই অগ্নি-তত্ত্ব জানেন তাঁহার জন্য অবশ্য জল-সমাগম হয়।

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তা-সৌনামাঽয়মিদংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামাঽয়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্‌বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত, একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব একং ভবন্তি। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মাঽনেন

১। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে উহা যেমন স্বীয় কারণ মৃত্তিকাপিণ্ডে অব্যাকৃতরূপে অবস্থান করে, তেমনি স্থূল নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে জগৎ স্বীয় কারণ হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত ছিল।

২। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত মিলিত হইয়া ক্রমে স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করে। সুতরাং আকাশ বায়ু ও তেজ পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে (তৈত্তিরীয় ২।৬)।

হ্যেতৎ সর্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥

বৃহদারণ্যক ১।৪।৭

এই সেই[১] জগৎ তখন অপ্রকাশ ছিল। তারপর "ইহার এই নাম," "ইহার এই রূপ," এই প্রকারে উহা কেবল নামরূপের দ্বারা প্রকাশিত হইল। এখনও "ইহার এই নাম," "ইহার এই রূপ," ইত্যাদি প্রকারে জগৎ কেবল নামরূপ সহায়ে অভিব্যক্ত হয়। ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর, অথবা স্বকীয় উৎপত্তিস্থানে যেমন অগ্নি প্রতিষ্ঠ থাকে, ঠিক সেইরূপ এই আত্মা নিখিল দেহের সর্বত্র নখাগ্র পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কারণ (তাহারা তাঁহাকে অংশতঃ দেখে বলিয়া) তিনি তাহাদের নিকট অসম্পূর্ণ। যথা, তিনি যখন প্রাণ-ক্রিয়াই করেন তখন প্রাণ নামে, যখন কথা বলেন তখন বাগিন্দ্রিয় নামে, যখন দেখেন চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে, যখন শ্রবণ করেন তখন শ্রবণেন্দ্রিয় নামে, যখন মনন করেন তখন মন নামে তিনি পরিচিত হন। এই সকল তাঁহার কর্মানুরূপ নাম মাত্র। ইহাদের (প্রাণাদির) মধ্যে যিনি কেবল মাত্র একটিকে (আত্মারূপে) উপাসনা করেন, তিনি জানেন না; কারণ এইরূপ চিন্তার ফলে আত্মা অপূর্ণ থাকেন। আত্মা এইরূপ (পূর্ণ) জানিবে। কারণ ইহাতেই সকলে একীভূত হয়। এই আত্মাকেই জান। কারণ পদচিহ্ন-অবলম্বনে যেরূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় সেরূপ ইহাকে জানিলেই সব জানা যায়। যিনি এরূপ জানেন তিনি যশ ও (স্বজন) সঙ্গলাভ করেন।

১। সৃষ্টির পূর্বে বীজাকারে মহাকারণে লীন জগৎই সৃষ্টির পরে পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে প্রকাশ পায়। কাজেই 'সেই' অদৃশ্য বীজ ও 'এই' পরিদৃশ্যমান জগৎ মূলতঃ একই।

জীব বা জীবাত্মা

সাধারণতঃ 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই জীব। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তানুসারে ঐ আমি বা জীবই পরব্রহ্ম। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে জীব বলিতে যাহা বুঝায় শাস্ত্রকারের সিদ্ধান্তানুসারে তাহা সূক্ষ্ম শরীর মাত্র। একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—ইহাদের সম্মিলিত অবস্থাই ঐ সূক্ষ্ম শরীর। সংস্কার, বাসনা প্রভৃতি ঐ সূক্ষ্ম শরীরেরই ধর্ম। উহাই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। যতক্ষণ উহা স্থূল শরীরের ভিতর অবস্থান করে ততক্ষণই মানুষ জীবিত থাকে; উহা বহির্গত হইলেই মৃত্যু হয়।

স্বরূপ

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥

কঠ ২।৩।১৭

এই অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত[১]। তিনি সর্বদা সকলের হৃদয়ে বর্তমান। মুঞ্জ ঘাস হইতে শীষ যেরূপ যত্নে পৃথক করিতে হয় সেরূপ

১। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহাদের মিলিত অবস্থার নাম সূক্ষ্ম শরীর। ঐরূপ সূক্ষ্ম শরীরকেই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র বলা হইয়াছে এবং উহাই ব্যবহারিক জীবনে জীব নামে অভিহিত হয়। ঐ সূক্ষ্ম শরীর ভোগের জন্য যখন কোন স্থূল শরীরকে আশ্রয় করে তখনই উহা জন্ম নামে অভিহিত হয়, এবং ঐ সূক্ষ্ম শরীরের স্থূল দেহ

ধৈর্যের সহিত এই আত্মাকে শরীরাদি হইতে পৃথক করিতে হইবে। এই আত্মাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; তাঁহাকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

অ ব স্থা ত্র য়[১]

স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাঃ; তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি॥

ঐতরেয় ১।৩।১২

তিনি (পরমেশ্বর) মূর্ধা বিদীর্ণ করিয়া সেই দ্বারেই প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বারটির নাম বিদৃতি। এই জন্যই এই দ্বার পরানন্দ লাভের উপায়। তাঁহার (জীবদেহে প্রবিষ্ট আত্মার) বাসস্থান তিনটি এবং স্বপ্নও তিনটি (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি)। এই (দক্ষিণ চক্ষু) একটি বাসস্থান, এই (মন) একটি বাসস্থান এবং এই (হৃদয়) একটি বাসস্থান।

পরিত্যাগকেই মৃত্যু বলা হয়। মহাভারতে সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যানে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে যম সত্যবানের স্থূল শরীর হইতে পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে 'অঙ্গুষ্ঠ মাত্র' কথাটি উপলক্ষণ। উহা অতি সূক্ষ্ম ইহাই তাৎপর্য।

১। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা সাধারণ অনুভব-সিদ্ধ। প্রত্যেক অবস্থার বাহিক তারতম্য থাকিলেও ত্রিবিধ অবস্থাতেই অনুভবিতা একজনই থাকেন। সুতরাং অবস্থাত্রয়ের ভিতরে যিনি অনুভবিতা তিনি এক এবং তিনি জীব ইহাই তাৎপর্য। পরবর্তী চারটি শ্লোকে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূল-ভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥

মাণ্ডূক্য ৩

আত্মার প্রথম পাদ বৈশ্বানর ; জাগ্রৎ অবস্থাই তাঁহার ভোগস্থান। বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে তিনি জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার অঙ্গ সাতটি, মুখ উনিশটি এবং তিনি স্থূল বিষয়ের ভোক্তা।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

মাণ্ডূক্য ৪

আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজস[১]—তাঁহার ভোগস্থান স্বপ্নাবস্থা, তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, তাঁহার অঙ্গ সাতটি, মুখ উনিশটি ; তিনি সূক্ষ্ম বিষয়ের ভোক্তা।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

মাণ্ডূক্য ৫

সুপ্তব্যক্তি যখন কোন কিছু কামনা করে না, বা স্বপ্নও দেখে না, তখন তাহাকে সুষুপ্ত বলে।[২] এই অবস্থায় যিনি স্থিত তিনি সর্ববিক্ষেপ

১। এখানেও তৈজস (বা স্বপ্নাবস্থ ব্যষ্টি প্রাণী) ও হিরণ্যগর্ভের ঐক্য আছে।

২। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাই নিদ্রা। জীব তিন অবস্থাতেই নিদ্রিত ; কারণ সর্বত্রই তত্ত্বের অননুভূতি আছে। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় আরও অধিক দোষ

রহিত হন[১]। তিনি শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দময়, এবং আনন্দের ভোক্তা। তিনি সকল অভিজ্ঞতার দ্বারস্বরূপ।[২] সেই প্রাজ্ঞই[৩] আত্মার তৃতীয় পাদ।

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥

ছান্দোগ্য ৬।৫।১

উদরস্থ অন্নের পরিণতি তিনভাবে ঘটে। উহার স্থূলাংশ মলে পরিণত হয়, মধ্যমাংশ মাংসে[৪] এবং সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়।

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥

ছান্দোগ্য ৬।৫।২

যে জল পান করা যায় তাহার স্থূলভাগ মূত্রে, সূক্ষ্মভাগ শোণিতে এবং সূক্ষ্মতম ভাগ প্রাণে পরিণত হয়।

এই যে, উহাতে তত্ত্বের অন্যথা গ্রহণও আছে। এইরূপে চিরসুপ্ত জীবেরও প্রাত্যহিক স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে একটা বিশেষত্ব আছে। (ঐঃ ১।৩।১২)

১। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত মনোবিক্ষেপরূপ দ্বৈতসমূহ সেখানে কারণের সহিত মিলিত হওয়ায় পৃথকরূপে অনুভূত হয় না। এইজন্য সেই অবস্থায় উপহিত আত্মাকে মূলে একীভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে দ্বৈত লীন হয় না; কারণ পুনরায় নিদ্রাবসানে দ্বৈত জগতের উৎপত্তি হয়।

২। সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ উৎপন্ন হয়।

৩। পূর্বের ন্যায় এখানেও প্রাজ্ঞ (জীব) ও ঈশ্বরের অভেদ বুঝিতে হইবে।

৪। মধ্যমাংশ তরল রুধিরাদিতে পরিণত হইয়া ক্রমে মাংস হয়।

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ॥

ছান্দোগ্য ৬।৫।৩

ঘৃত প্রভৃতি উদরস্থ হইলে তাহার পরিণতি তিনভাবে ঘটে। স্থূল অংশ অস্থি, সূক্ষ্ম অংশ মজ্জা এবং সূক্ষ্মতম অংশ বাক্[১]-এ পরিণত হয়।

এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি ॥

ছান্দোগ্য ৬।৬।২

হে সৌম্য, এইরূপে ভক্ষিত দ্রব্যের সূক্ষ্ম অংশ উপরে উঠিয়া মনে পরিণত হয় (অর্থাৎ মনকে পুষ্ট করে)।

অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি ॥

ছান্দোগ্য ৬।৬।৩

হে সৌম্য, যে জল পান করা হয় তাহার সূক্ষ্মাংশ ঊর্ধ্বগামী হইয়া প্রাণে পরিণত হয়।

তেজসঃ সোম্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি সা বাগ্ ভবতি ॥

ছান্দোগ্য ৬।৬।৪

১। ঘৃতাদি তৈজস পদার্থ ভোজনে বাগ্মিতা হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হে সৌম্য, ঘৃত জাতীয় জিনিষ ভক্ষিত হইলে তাহার সূক্ষ্মাংশ ঊর্দ্ধগামী হয় এবং বাক্‌রূপে পরিণত হয়।

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনাঽনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥

ছান্দোগ্য ৬।১১।১

হে সৌম্য, জীবাত্মা সম্মুখে অবস্থিত বৃক্ষটির সর্বাবয়ব ব্যাপিয়া আছেন বলিয়াই উহার মূলদেশে আঘাত করিলে বৃক্ষটি জীবিত থাকে এবং ক্ষতস্থান হইতে রসক্ষরণ করে। সেরূপ বৃক্ষটির মধ্যভাগে বা অগ্রভাগে আঘাত করিলেও বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকে এবং সেই সেই স্থান হইতে রসক্ষরণ করে।

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতীতি ॥

ছান্দোগ্য ৬।১১।২

বৃক্ষটির কোন একটি শাখা হইতে জীবাত্মা সরিয়া আসিলে ঐ শাখা শুকাইয়া যায়। সেরূপ দ্বিতীয় বা তৃতীয় একটি শাখাকে ত্যাগ করিলে উহাও শুকাইয়া যায়। সম্পূর্ণ বৃক্ষটিকে ত্যাগ করিলে সমগ্র বৃক্ষই শুকাইয়া যায়।

এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽণিমৈত-

দাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি……।

ছান্দোগ্য ৬।১১।৩

[পিতা বলিলেন] হে সৌম্য, এইরূপই জানিবে—জীব মরে না। জীব-ত্যক্ত দেহই মরে। এই সমগ্র জগৎ সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল কারণের দ্বারা আত্মবান। হে শ্বেতকেতো, তুমিও তাহাই (আত্মা)।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

কঠ ১।৩।৩

এই শরীররূপ রথের রথী জীবাত্মা, সারথি বুদ্ধি, এবং মন লাগাম বলিয়া জানিবে।[১]

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥

কঠ ১।৩।১

১ অচেতন শরীর সচেতন আত্মার সংস্পর্শ ব্যতিরেকে কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত হইতে পারে না। রথী ও রথরূপ রূপকের সাহায্যে ইহাই বুঝান হইয়াছে। এখানে সূক্ষ্মভাবে শরীর মন প্রভৃতি জড়পদার্থের অতিরিক্ত চেতন আত্মা স্বীকারের যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে প্রবৃত্তিশীল যে কোন অচেতন পদার্থই কোন একটি চেতন-সংশ্লিষ্ট হয়। সুতরাং অচেতন শরীরও চেতনের সংস্পর্শ ভিন্ন প্রবৃত্তিবান হইতে পারে না। যিনি চেতন তিনিই আত্মা।

কর্মফলের অবশ্যম্ভাবী ভোক্তা যে দুইজন পুরুষ[১] ভোগায়তন এই শরীরের অভ্যন্তরে পরব্রহ্মের উত্তম উপলব্ধিস্থান বুদ্ধিরূপ গুহায় প্রবিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ, পঞ্চাগ্নিকগণ[২] ও ত্রিনাচিকেতগণ আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ বলিয়া থাকেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥

মুণ্ডক ৩।১।১

সমান রূপ ও নাম বিশিষ্ট দুইটি পাখী একই বৃক্ষে বাস করে। তন্মধ্যে একটি নানাস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করে। অপরটি কিছু ভক্ষণ করে না। সে কেবল দর্শন করে।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

১। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর। এখানে ফলভোগকারী মাত্র জীব, কিন্তু ঈশ্বরকেও ছত্রিন্যায়ে কর্মফলভোক্তা বলা হইল। দলের অনেকের ছত্র থাকিলে যেরূপ বলিতে পারা যায় যে ছত্রধারীরা যাইতেছে। সেইরূপ একজন অর্থাৎ জীব ভোক্তা হইলেও তাঁহার সান্নিধ্য বশতঃ পরমাত্মাকেও কর্মফলভোক্তা বলা হইল।

২। পঞ্চাগ্নি=গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য ও আবসথ্য। এই সকল অগ্নিতে গৃহস্থগণ যজ্ঞ করিতেন। অথবা পঞ্চাগ্নি=দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী। অগ্নি-স্থানীয় এই সকলে ক্রমান্বয়ে হুত হইয়া জীব সংসারে জাত হয়। গৃহস্থ এই অগ্নিসমূহের উপাসনা করিতেন।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

মুণ্ডক ৩।১।২

দেহ-বৃক্ষে একান্ত আসক্তি নিবন্ধন জীব বিমূঢ় হইয়া মুহ্যমান হয়। আবার যখন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত বহুজনসেবিত ঈশ্বরকে আপনা হইতে অভিন্নরূপে জানিতে পারে তখনই সে সকল শোকের অতীত হয়।[১]

১। প্রথম পক্ষী=জীবাত্মা; দ্বিতীয় পক্ষী=পরমাত্মা; বৃক্ষ=দেহ; ফল=সুখদুঃখরূপ কর্মফল; ঈশ্বর=দ্বিতীয় পক্ষী=পরমাত্মা।

ঈশ্বর

উৎপত্তি-বিনাশশীল সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি একটি বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার অধীন ; অতএব উৎপন্ন বস্তুর অতিরিক্ত ঐরূপ বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার কল্পনা-কারী একজন কেহ আছেন ইহা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে যিনি রহিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর—ইহাই শাস্ত্রকারদের সিদ্ধান্ত। ঐ ঈশ্বর অশরীরী নিত্যচৈতন্য-ময় ও সর্বশক্তিমান। কারণ এইরূপ না হইলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই কালত্রয়ের সমস্ত পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে ইহাই ঈশ্বর-স্বীকারের যুক্তি এবং ঈশ্বরের স্বরূপ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।১৪

সেই পুরুষের অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ ; তিনি সমগ্র ভুবনকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াও নাভির দশাঙ্গুল উর্ধ্বে হৃদয়ে বিরাজিত আছেন। (অথবা জগৎকে অতিক্রম করিয়া তাহার বহির্দেশেও বিরাজমান রহিয়াছেন।)

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।১১

যিনি এক হইয়াও সর্ববস্তুতে অধিষ্ঠিত, যাঁহাতে এই সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয় এবং যাঁহা হইতে আবার উৎপন্ন হয়, সেই মঙ্গলনিদান স্তবনীয় পরম দেবতার দর্শন লাভ করিয়া লোক পরাশান্তি লাভ করে।

যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।১৩

যিনি দেবতাগণের অধিপতি, সমস্ত লোক যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, যিনি সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের শাসক, সেই আনন্দঘন পরমেশ্বরকে ঘৃতাদি দ্বারা অর্চনা করি।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্-
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ১।৮

ঈশ্বর নশ্বর ও অবিনশ্বর কার্য ও কারণ রূপে যুক্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই অনীশ্বর (অর্থাৎ জীব) রূপে ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন আবদ্ধ হন; আবার পরমেশ্বরকে জানিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ১।১০

প্রকৃতি বিনাশশীল ; অজ্ঞান-নাশক পরমেশ্বর অমর ও অবিনাশী। সেই এক ঈশ্বরই প্রকৃতি ও পুরুষকে নিয়মিত করেন। অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ তাঁহার ধ্যান করিলে, অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ ঘটিলে, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, প্রপঞ্চরূপ মায়ার অবসান ঘটে।

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।৫

সেই ঈশ্বর সকলের কারণ। দেহধারণ ও পাপপুণ্যের তিনিই হেতু। তিনি কালত্রয়ের পার এবং অংশহীনরূপে অনুভূত হন। সেই বিশ্বরূপ সকল কারণের কারণ, সত্যস্বরূপ, পূজনীয় দেবকে প্রথমে নিজের হৃদয়ে অবস্থিত—এইরূপে উপাসনা করিয়া (সাধক বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)।

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।

ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।৬

যাঁহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইতেছে তিনি সংসারবৃক্ষ ও কালের নানা পরিণতির ঊর্ধ্বে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত। ধর্মের মূল, পাপমোচক, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন, হৃদ্‌গুহায় অবস্থিত, অমৃতস্বরূপ বিশ্বের আশ্রয়কে জানিয়া (সাধক বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত হন)।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।৭

দেবগণেরও (লোকপাল) পরম অধিপতি, ইন্দ্রাদি দেবগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিদের ঈশ্বর, শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও উত্তম, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সেই পরম দেবতাকে আমরা জানি।

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।৮

সেই পরম দেবতার দেহও নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই। তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাহাকেও দেখা যায় না। শ্রুতি বলেন, ইহার পরাশক্তি বিচিত্র কার্যকারিণী এবং ইহার জ্ঞান বল ক্রিয়াও[১] এই শক্তির অন্তর্গত।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।৯

ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার কেহ পতি বা নায়ক নাই। তাঁহার জ্ঞাপক কোন চিহ্ন নাই। তিনিই সকলের কারণ; ইন্দ্রিয়গণের কর্তা জীবেরও তিনি অধিপতি। ইঁহার কোন জনক বা প্রভু নাই।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥

মুণ্ডক ১।১।৯

যাঁহার জ্ঞান অপ্রতিহত, সমগ্র সৃষ্টি যাঁহার জ্ঞাত, তপস্যা যাঁহার জ্ঞানময়, সেই ব্রহ্ম হইতেই স্রষ্টা, নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়।

১। জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশিকা অবিদ্যাবৃত্তি ও অন্তঃকরণবৃত্তি; বল অর্থাৎ উৎসাহ; ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যাপার, কর্ম।

অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া

প্রমাণের সাহায্যেই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নির্ধারিত হইয়া থাকে। সমস্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। কিন্তু যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি সর্বত্র তাহাই যে ঠিক ইহা বলা যায় না। দূর হইতে ঝিনুককে রূপার টুকরা অথবা রজ্জুকে সর্প বলিয়া প্রত্যক্ষ করা ব্যবহারিক জীবনে অনুভব-সিদ্ধ। প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও বস্তুর স্বরূপ ঠিক ঠিক কেন প্রকাশিত হয় না তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা বেদান্ত-শাস্ত্রে অবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ অবিদ্যা অনাদি এবং ভাব-পদার্থ। বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হইলেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অনাদি কাল হইতে এই অবিদ্যার প্রভাবে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইয়াও নিজের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না। অবিদ্যার আবরণ-শক্তির প্রভাবে আত্মার নিত্য-শুদ্ধ-চৈতন্য স্বরূপ আবৃত হইয়া যায় এবং বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে উহা বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হয়।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥ ইতি।

বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯

নিজেকে প্রকট করিবার জন্য ঈশ্বর সকল রূপে[১] রূপান্তরিত

১। প্রতিরূপ শব্দের অর্থ "অনুরূপও" হইতে পারে, অর্থাৎ পিতামাতার রূপের অনুযায়ী সন্তান জাত হয়—মানুষ হইতে মানুষ, পশু হইতে পশু, ইত্যাদি।

হইলেন।[১] মায়াবশতঃ[২] তিনি নানাভাবে অনুভূত হন। কারণ ইহাতে দশটি, এমন কি শত শত, ইন্দ্রিয় যুক্ত আছে।

…তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ॥

বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

নিজের আত্মাই যে ব্রহ্ম বামদেব ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং উহার ফলে জানিয়াছিলেন, "আমি মনু, আমিই সূর্য হইয়াছিলাম।" আমি ব্রহ্ম—এইরূপে যিনিই এই ব্রহ্মকে জানিবেন, তিনিই (আত্মভাবে) যে সব, এই জ্ঞানও তাঁহার লাভ হইবে। তাঁহার এই সর্বাত্মকত্ব দেবগণও রোধ করিতে পারেন না। কারণ তিনি দেবগণেরও আত্মা। আর যিনি নিজেকে এবং তাঁহার উপাস্য দেবতাকে পৃথক পৃথক মনে করিয়া পৃথকভূত দেবতার উপাসনা করেন তিনি অবিদ্বান। দেবগণের

১। কারণ নামরূপের অভিব্যক্তি হইলেই শাস্ত্রোপদেশ, গুরুশিষ্যব্যবহারাদি, ও ব্রহ্মকে জানা সম্ভব হয়; অন্যথা অসম্ভব।

২। মায়া এক হইলেও বুদ্ধিভেদ বশতঃ বহু, এজন্য বহুবচন।

নিকট তিনি পশু সদৃশ[১]। যে ভাবে বহু পশু কোন এক ব্যক্তিকে পালন করে সেই ভাবে এক এক ব্যক্তি দেবগণকে (পূজাদি দ্বারা) পালন করে। একটি মাত্র পশুও যদি অপহৃত হয় তবে (তাহার মালিক) খুবই দুঃখিত হন। আর যদি সকল পশুই অপহৃত হয় তাহা হইলে তো কথাই নাই। এই জন্যই মনুষ্যগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ইহা দেবগণের বাঞ্ছনীয় নহে[২]।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

কঠ ১।২।২৪

যে অশুভ কর্ম হইতে বিরত হয় নাই, যে ইন্দ্রিয়াধীন, চঞ্চলচিত্ত, যাহার মানসিক বৃত্তিসমূহ অশান্ত, সে ইহাকে লাভ করিতে পারে না। ইনি কেবল প্রজ্ঞানের দ্বারাই লভ্য।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

কঠ ২।১।১০

১। ইহা অবিদ্যাসূত্র, অর্থাৎ এই বাক্যে অবিদ্যার স্বরূপ ও তাহার ফল সংসার প্রাপ্তি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

২। মানুষ যেমন নিজের পশুকে ছাড়িতে চায় না, তেমনি দেবগণ যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা আপনাদের তৃপ্তিসাধক মানুষকে ছাড়িয়া দিতে চান না। দেবগণ কেবল অবিদ্যাবান্ মনুষ্যগণের প্রতিই অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। অবিদ্যাধীন যাহাদিগকে তাঁহারা মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে শ্রদ্ধাদিযুক্ত করেন, অন্যদিগকে অশ্রদ্ধাদিযুক্ত করেন। অতএব বিদ্যালাভের উদ্দেশে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে দেবগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য দেবারাধনায় তৎপর হওয়া উচিত।

এখানে যাহা আছে, সেখানেও তাহাই আছে। সেখানেও যাহা আছে, এখানেও তাহাই। ইহাতে (অর্থাৎ এই ব্রহ্মে) বহু-দর্শনকারী মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করে। (অর্থাৎ তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ হয়।)

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥

ঈশ ১৪

যিনি (মূল) প্রকৃতি এবং হিরণ্যগর্ভকে এক জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভকে উপাসনা করিয়া মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং (মূল) প্রকৃতির উপাসনায় অমরত্ব লাভ করেন।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥

মুণ্ডক ১।২।৯

নানাভাবে অজ্ঞানে আবৃত অবিবেকীগণ "আমরা কৃতার্থ" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। কারণ আসক্তি-বশতঃ কর্মানুরাগীগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, এবং এই জন্যই তাহারা কর্মফল ভোগান্তে দুঃখার্ত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হয়।

কর্ম ও কর্মফল

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'গহনা কর্মণো গতিঃ' অর্থাৎ কর্মের স্বরূপ দুর্বিজ্ঞেয়। অনুষ্ঠাতার উদ্দেশ্যভেদে একই কর্ম বিভিন্ন ফল দান করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়—বিদ্যালাভের ফলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদিত হইলে কেহ কেহ ঐ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে সৎকর্মানুষ্ঠানে, কেহ বা দুষ্কর্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত সুদক্ষ হয়। শুভবুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান করিলে বিশিষ্ট ফললাভ হয়। পক্ষান্তরে, ঐ পরিমার্জিত বুদ্ধির প্রভাবে সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিলে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাহায্যে নির্বাণলাভ হইয়া থাকে। উপনিষদের মতে যে অনুষ্ঠানের ফলে আত্মিক উন্নতি লাভ হয় উহাই প্রকৃত কর্মপদবাচ্য। ঐ কর্মানুষ্ঠান সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের অনুশীলনাত্মক। প্রথমতঃ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে। ঐ অনুষ্ঠেয় কর্মকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ মানুষের পরমায়ু ১১৬ বৎসর কল্পনা করিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানাত্মক কর্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ কর্ম তিন-ভাগে বিভক্ত, তাহাই আলোচিত হইতেছে।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তি ॥

ছান্দোগ্য ৩।১৬।১

মানবের সারাটি জীবনই এক যজ্ঞস্বরূপ। তাহার জীবনের প্রথম

চব্বিশ বৎসর প্রভাতী হোমস্বরূপ।[১] প্রভাতী যজ্ঞে গায়ত্রীছন্দে স্তোত্র পঠনীয়। গায়ত্রীছন্দ চতুর্বিংশতি অক্ষরযুক্ত। পুরুষ-যজ্ঞের এই প্রভাতী হোমে বসুগণ[২] যুক্ত আছেন। প্রাণসকলই বসু, কারণ তাহারাই এই ভূতসমূহকে (দেহে) বাস করাইয়া থাকে।

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি॥

ছান্দোগ্য ৩।১৬।৩

ইহার পর (জীবনের) যে চুয়াল্লিশ বৎসর তাহা মধ্যাহ্ন-যজ্ঞ। ত্রিষ্টুপ ছন্দের অক্ষর-সংখ্যা চুয়াল্লিশ। মধ্যাহ্ন-যজ্ঞে ত্রিষ্টুপ ছন্দের মন্ত্র পঠিত হয়। এই যজ্ঞে রুদ্রগণ যুক্ত আছেন। প্রাণসমূহই রুদ্র। কারণ ইহারাই সকল ভূতকে রোদন করায়।[৩]

অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে॥

ছান্দোগ্য ৩।১৬।৫

১। অগ্নিষ্টোম সোমযাগ তিন সবনে সম্পাদ্য—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন।

২। অষ্টবসু : ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ॥

৩। রুদ্র শব্দের অর্থ যিনি রোদন করেন বা ক্রন্দন করান। মধ্যম বয়সে প্রাণবৃন্দ নিষ্ঠুর হয় ; সুতরাং উহারা নিজের ও পরের দুঃখের কারণ হয়।

ইহার পরবর্তী আটচল্লিশ বৎসরকাল (অপরাহ্ণ) তৃতীয় যজ্ঞ। জগতী ছন্দের অক্ষর-সংখ্যা আটচল্লিশ। তৃতীয় যজ্ঞে জগতী ছন্দের মন্ত্র পাঠ হয়। আদিত্যগণ[1] এই যজ্ঞে যুক্ত আছেন। প্রাণসকলই আদিত্য। কারণ ইহারাই ভূতসমূহকে আদান বা গ্রহণ করিয়া থাকে।

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবং প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ ॥

ছান্দোগ্য ৩।১৬।৭

ইতরার পুত্র মহিদাস এই যজ্ঞবিজ্ঞান জানিয়া বলিয়াছিলেন, "হে মৃত্যু, তুমি কিজন্য আমাকে এইরূপে সন্তাপিত করিতেছ? ইহাতে আমি মরিব না।" (এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলে) তিনি একশত ষোল বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। যে কেহ এইরূপ (যজ্ঞসম্পাদন-বিদ্যার) জ্ঞান লাভ করিবেন, তিনিও সুস্থ শরীরে একশত ষোল বৎসর জীবিত থাকিবেন।

ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি

১। দ্বাদশ আদিত্য—

ধাতা মিত্রোঽর্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে ॥

প্রাণগণকে আদিত্য বলা হইয়াছে; কারণ আদিত্য যেমন রসাদি গ্রহণ করেন, তেমনি ইহারা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণসমূহ, শব্দাদি বিষয় আদান করে।

মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ—তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি।

তৈত্তিরীয় ৩।১০।২

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে (ক্ষেম) বাক্যে, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে (যোগক্ষেম) প্রাণ ও অপানে, ক্রিয়ারূপে হস্তদ্বয়ে, গতিরূপে পাদদ্বয়ে, ত্যাগরূপে পায়ুতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানে উপাসনা করিবে। মানুষের সম্বন্ধে এই উপাসনা। অনন্তর দৈবী উপাসনা বলা যাইতেছে।—বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে,

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃত-মানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি।

তৈত্তিরীয় ৩।১০।৩

পশুগণের মধ্যে যশোরূপে, নক্ষত্র সমূহের মধ্যে জ্যোতিরূপে, জননেন্দ্রিয়ে সন্তানোৎপাদনরূপ অমৃতত্ব ও সুখরূপে এবং আকাশে আকাশরূপী ব্রহ্মকে সর্বাধাররূপে উপাসনার ফলে সাধক প্রতিষ্ঠাবান হন; তাঁহাকে মহৎরূপে উপাসনা করিলে সাধক মহান্ হন এবং মনরূপে উপাসনা করিলে সাধক মননশীল হন।

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণং

ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ।

তৈত্তিরীয় ৩।১০।৪

বিভিন্নভাবের উপাসনায় সাধক বিভিন্ন ফল লাভ করিয়া থাকেন—যেমন, তাঁহাকে পূজ্যরূপে উপাসনা করিলে সমুদয় ভোগ্য বস্তু লাভ হয়, শ্রেষ্ঠরূপে উপাসনা করিলে প্রাধান্য লাভ হয়, সংহাররূপে উপাসনা করিলে তাঁহার বিদ্বেষকারী ও অপ্রিয় শত্রুগণ নাশ হয়। এই পুরুষের মধ্যে যে পরমাত্মা বাস করেন এবং সূর্যমণ্ডলে যিনি বাস করেন উভয়ই এক।

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মান-মুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনো-ময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এত-মানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নীকামরূপ্যনু-সঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু।

তৈত্তিরীয় ৩।১০।৫

এবংবিধ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া অন্নময় আত্মাতে মিলিত হন। তৎপর ক্রমে প্রাণময় আত্মাতে, মনোময় আত্মাতে, বিজ্ঞানময় আত্মাতে এবং পরিশেষে আনন্দময় আত্মাতে মিলিত হন। পরে যদৃচ্ছা অন্ন ও রূপ লাভ করিয়া পৃথিব্যাদি নানা লোকে পর্যটন করিতে করিতে "অহো, অহো, অহো" এই ব্রহ্মসাম্য গান করিয়া থাকেন।

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা

ঋতা ৩ স্য। পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবন-মভ্যভবাম্ ৩। সুবর্ণজ্যোতীঃ যঃ এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥

তৈত্তিরীয় ৩।১০।৬

আমিই কর্ম, আমিই কর্তা। কর্ম ও কর্তার সংযোগও আমি। আমিই সর্বাগ্রে জাত। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জগতের এবং দেবগণেরও আমি পূর্ববর্তী। অমরত্ব আমাতে বিদ্যমান। কর্মের কর্তারূপে যিনি আমাকে জানেন তিনি আমারই উপাসনা করেন। আর যিনি আমাকে কর্তারূপে জানেন না তিনি কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন। পরমেশ্বররূপে আমি সমস্ত জগতের শাসক। আদিত্যের ন্যায় আমার জ্যোতিসমূহ সর্বদা প্রকাশশীল —ইহাই পরমার্থ তত্ত্ব। যিনি এরূপ জানেন তিনি মোক্ষলাভ করেন।

[ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়করূপে প্রতীক উপাসনার কথা বিবৃত হইতেছে। গায়ত্রী ব্রহ্মের প্রতীক। এজন্য গায়ত্রীর উপাসনা বর্ণিত হইতেছে :]

গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ॥

ছান্দোগ্য ৩।১২।১

যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই গায়ত্রী[১]। বাক্‌ই গায়ত্রী, কারণ এই বাক্ প্রাণীগণের (নাম) গান করে এবং তাহাদের সকলকে রক্ষা করে।

১। এখানে গায়ত্রী শব্দ ব্রহ্মের লক্ষক। গায়ত্রী নামক ছন্দঃ অবলম্বন করিয়া ঐ গায়ত্রীতে অনুগত ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য।

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাঽভ্যনূক্তম্‌ ॥
তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ ।
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥

ছান্দোগ্য ৩।১২।৫-৬

এই সেই গায়ত্রী। ইহা চারিটি চরণবিশিষ্ট এবং ছয়প্রকার। ঋক্‌মন্ত্রেও এই গায়ত্রীই প্রকাশিত হইয়াছেন।

গায়ত্রী-নির্দিষ্ট ব্রহ্মের বিভূতিও সমপরিমাণ। কিন্তু পুরুষ (পূর্ণ ব্রহ্ম) তাহা হইতেও মহত্তর। কারণ জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁহার এক পাদস্বরূপ[২] মাত্র। তাঁহার অতিরিক্ত তিন পাদ অমৃতময় এবং দিব্যধাম।

[এখন সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত হইতেছে :]

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত ॥

ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। কারণ তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। অতএব সংযতচিত্তে তাঁহার

২। ব্রহ্মে অংশ না থাকিলেও মিথ্যা জগতের তুলনায় ব্রহ্ম যে অনন্ত ইহাই বুঝাইবার জন্য উপদেশচ্ছলে অংশ কল্পনা করিয়া বলা হইল যে, ব্রহ্ম এক অংশে মাত্র বিবর্তিত হন, কিন্তু অপর তিন অংশে তিনি অমৃত বা নির্বিকার।

উপাসনা কর। মানুষ স্বীয় দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ। সে ইহজীবনে যেরূপ প্রত্যয়যুক্ত হয়, দেহাবসানে তাহার গতি তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব দৃঢ়প্রত্যয়বান হইবে (অর্থাৎ ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইবার জন্য যোগ্য উপাসনা[১] করিবে)।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥

ছান্দোগ্য.৩।১৪।২

সেই মনোময়, প্রাণশরীর-বিশিষ্ট, দীপ্তিমান্, সিদ্ধসঙ্কল্প, সর্বব্যাপী, সকল কার্যের কর্তা, সকল কামনার কর্তা, সকল গন্ধ ও সকল রসের আশ্রয়, যিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্তমান, যাঁহাতে কোন ইন্দ্রিয় নাই এবং যিনি আগ্রহশূন্য—

এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥

ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩

হৃদ্‌পদ্মে অবস্থিত আমার সেই আত্মা, ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক বা শ্যামাক-তণ্ডুল হইতেও সূক্ষ্মতর ; হৃদ্‌পদ্মে অবস্থিত আমার এই আত্মা

১। ভাববিশেষকে দীর্ঘকাল অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া রাখাকেই উপাসনা বলে। বর্তমান স্থলে ইহাই বলা হইল যে তত্ত্বনিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ অধিকারীর পক্ষে উপাসনা। অবলম্বনীয়।

পৃথিবী হইতেও বিশালতর, অন্তরিক্ষ হইতেও বৃহত্তর, দিব্যলোক হইতেও মহত্তর,—এই সমস্ত লোক হইতেই বিশালতর।[১]

সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্য-নাদর এব ম আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসং-ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি···॥

ছান্দোগ্য ৩।১৪।৪

"সকল কর্মের কর্তা, সকল কামনার কর্তা, সকল গন্ধ ও সকল রসের আশ্রয়,—যিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্তমান, যাঁহাতে কোন ইন্দ্রিয় নাই এবং যিনি আগ্রহশূন্য, তিনিই হৃদপদ্মে অবস্থিত আমার এই আত্মা। ইনিই ব্রহ্ম, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া আমি ইহাকেই পাইব।" যাঁহার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় আছে এবং যাঁহার এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করিবেন।

শ্রৌ ত ক র্ম

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৫।৭

১। প্রথমে আত্মাকে সূক্ষ্ম বলা হইল, কিন্তু পাছে কেহ মনে করে যে আত্মা অণু-পরিমাণ, এইজন্য তাঁহাকে পৃথিব্যাদি অপেক্ষা বড় বলা হইল। তথাপি মনে হইতে

কর্ম ও উপাসনাসম্ভূত সংস্কারযুক্ত সকাম কর্মে রত ব্যক্তি স্বকীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। নানা দেহধারী সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট, ধর্মাধর্মাদি তিনমার্গে গমনকারী ও প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণের কর্তা এই জীব নিজ কর্মফল অনুসারে বিচরণ করিয়া থাকেন।

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥

মুণ্ডক ১।২।৬

সূর্যরশ্মি সহায়ে জ্যোতির্ময় আহুতি-সকল সেই যজমানকে "এস, এস, ইহাই তোমাদের পুণ্যফল, ইহাই তোমাদের নিজ কর্মার্জিত মার্গ, ইহাই ব্রহ্মলোক" এইরূপে স্তুতি ও পূজা করিতে করিতে বহন করিয়া লইয়া যায়।

সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চোষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ স্বর ইতীমমাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্ বা এতমিমমমুং চোদ্গীথ-মুপাসীত ॥

ছান্দোগ্য ১।৩।২

প্রাণ এবং সূর্য উভয়ই সমতুল্য। প্রাণ উষ্ণ,[১] সূর্যও উষ্ণ। প্রাণকে গমনশীল এবং সূর্যকে অস্তগমনশীল ও প্রত্যাগমনশীল বলা হইয়া

পারে যে আত্মা পৃথিব্যাদিরই মত, সেইজন্য তাঁহাকে অনন্ত বলা হইল।

১। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ দেহ উষ্ণ বোধ হয়।

থাকে।[১] এইজন্য এতাদৃশ নামরূপযুক্ত প্রাণ ও সূর্যরূপে ওঁ-কারের উপাসনা করিবে।

ই ষ্টা পূ র্ত[২]

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে; ত এব পুনরাবর্তন্তে। তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥

প্রশ্ন ১।৯

সংবৎসরকেই প্রজাপতি বলে। তাঁহার অয়ন অর্থাৎ পথ দুইটি; যথা, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং কূপতড়াগখননাদি ক্রিয়া সযত্নে সম্পন্ন করেন তাঁহারা এই কর্মফলে কেবলমাত্র চন্দ্রলোকই জয় করেন এবং এইজন্য তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং যাঁহারা স্বর্গাভিলাষী ও পুত্রকামী তাঁহারা দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত হন। যাহা পিতৃযান তাহাই অন্ন। সুতরাং স্বর্গদ্রষ্টা সন্তানার্থী গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গ প্রাপ্ত হন। যাহা পিতৃমার্গ উহাই অন্ন।

১। সূর্য অস্তগমনের পর ফিরিয়া আসেন; কিন্তু প্রাণ মৃতদেহে আর আসে না।

২। ইষ্ট—অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুকম্পনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
পূর্ত—বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামং পূর্তমিত্যভিধীয়তে॥

নি ষ্কা ম ক র্ম

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥
আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ
কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।৩-৪

ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া আবার কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া একটি, দুইটি, তিনটি বা আটটি[১] অবলম্বনে এবং দৈবীগুণ ও বহুজন্মার্জিত পুণ্যবলে ইহজীবনে বা পরজন্মে সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির সংযোগ বিধান করিয়া যিনি যোগযুক্ত (ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি) হইয়া সকল কর্ম সম্পাদন করেন এবং প্রকৃতি ও তৎসম্ভূত সকল বস্তুকেই পরব্রহ্মে অর্পণ করেন, তিনি স্বস্বরূপে অবস্থিত হন এবং সংসারাতীত হন। প্রকৃতি ও তৎসম্ভূত সকল পদার্থ লয় হওয়ায় তাঁহার প্রারব্ধ[২] ভিন্ন অন্য সকল কর্ম নাশ হয় এবং প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

১। একটি—গুরুসেবা; দুইটি—গুরুভক্তি ও ঈশ্বর প্রেম; তিনটি—শ্রবণ, চিন্তন ও ধ্যান; আটটি—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

২। পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জিত যে সকল কর্মের ফলে বর্তমান দেহ হইয়াছে।

জন্মান্তর

এই পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব একমাত্র চার্বাক ভিন্ন অপরাপর সকল দার্শনিক এবং উপনিষদ্ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মৃত্যুকালে এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা বা জীব নামক বস্তুটি কোথায় যায় এবং কিভাবেই বা অন্য শরীর গ্রহণ করে এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য মুনিঋষিগণ যে চিন্তা করিয়াছেন তাহা দ্বারাই জন্মান্তর সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ আত্মা বা জীব অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া কোন ভোগ-দেহের আশ্রয় ব্যতীত শুভাশুভ কোন কর্মের ফলই ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পর সঞ্চিত কর্মফল ভোগ করিবার জন্য যেখানে যে অবস্থায় জীব বিদ্যমান থাকে, উহাই পরলোক বা জন্মান্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জ ন্ম

তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি ॥

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥

ছান্দোগ্য ৫।১০।৫-৬

[বিদেহী জীব] কর্মফল ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করেন। তাহার পর যে ভাবে গমন করিয়াছিলেন সেইভাবেই যেরূপ

বলা যাইতেছে সেই পথে আবার ফিরিয়া আসেন। (প্রথমে) তাঁহারা আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূমে, ধূম হইতে অভ্রে, অভ্র হইতে মেঘে এবং মেঘ হইতে (বারিরূপে) বর্ষিত হন। অনন্তর তাঁহারা এই পৃথিবীতে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি তিল, মাষ ইত্যাদি রূপে উৎপন্ন হন। এই ব্রীহি, যব প্রভৃতি হইতে নিষ্ক্রমণ খুবই কষ্টসাধ্য। যে কেহ ইহাদিগকে ভক্ষণ করে এবং সন্তানোৎপাদন করে তাহারই রূপ ধারণ করিয়া জীব জন্মগ্রহণ করেন।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাঽথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥

ছান্দোগ্য ৫।১০।৭

তন্মধ্যে যাঁহাদের ইহলোকে পূর্বার্জিত শুভ কর্মফল অবশিষ্ট আছে তাঁহারা শীঘ্রই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্যরূপে জন্মলাভ করেন। আর যাহাদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ কর্মফল (অবশিষ্ট) আছে, তাহারা শীঘ্রই কুক্কুর বা শূকর বা চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে।

মৃত্যু[1]

তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ

১। জীব কখনো মরে না। জীবের সহিত দেহের সম্বন্ধই জন্ম এবং এই সম্বন্ধের বিনাশই মৃত্যু।

প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্‌ ॥

ছান্দোগ্য ৬।৮।৬

জল ভিন্ন আবার কোথায় ইহার মূল থাকিতে পারে? হে সৌম্য, এই অঙ্কুর অবলম্বনে তেজরূপ মূল অন্বেষণ কর। তেজ-অঙ্কুর অবলম্বনে সৎরূপ মূলটি জানিতে চেষ্টা কর। সকল প্রাণীই এই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত এবং পরিণামে সতে লীন হয়। এই তিনটি দেবতা (তেজ, অপ্‌, ক্ষিতি) পুরুষ কর্তৃক ভুক্ত হইয়া যেরূপে ত্রিবৃৎ[১] হন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। হে সৌম্য, মহাপ্রস্থানকালে পুরুষের ইন্দ্রিয়-সমূহ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমদেবতায় সংহৃত হয়।

অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহুর্জানাসি মাং জানাসি মামিতি স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি ॥

ছান্দোগ্য ৮।৬।৪

অতঃপর যখন কেহ এইরূপ (রোগাদি নিবন্ধন) হীনবল হইয়া পড়ে, তখন তাহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করিতে

১। ত্রিবৃৎকরণ=বেদান্তের পঞ্চীকরণ। ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়াটি এইরূপ—প্রত্যেক মহাভূতকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া অপর অপ্রধান দুইটিকে তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। যথা—(সূক্ষ্ম) তেজ $\frac{১}{২}$+জল $\frac{১}{৪}$+পৃথিবী $\frac{১}{৪}$=স্থূল তেজ; (সূক্ষ্ম) পৃথিবী $\frac{১}{২}$+তেজ $\frac{১}{৪}$+ জল$\frac{১}{৪}$=স্থূল পৃথিবী; (সূক্ষ্ম) জল $\frac{১}{২}$+তেজ $\frac{১}{৪}$+পৃথিবী $\frac{১}{৪}$=স্থূল জল।

থাকে, "আমাকে চিনিতে পার? আমাকে চিনিতে পার?" যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেহ হইতে বহির্গত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত চিনিতে পারে।

অথ যদাঽস্য বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি॥

ছান্দোগ্য ৬।১৫।২

তারপর যখন তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমদেবতায় লীন হয়, তখন সে আর চিনিতে পারে না।

মৃ ত্যু অ ন্তে গ তি

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ॥

বৃহদারণ্যক ৪।৪।১১

যাহারা তত্ত্বজ্ঞানহীন এবং অবোধ, মরণান্তে তাহারা নিরানন্দময় অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে গমন করে।

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

ঈশ ৩

জ্যোতির্বিহীন ঘোরতমসাবৃত যে সকল লোক[১] আছে দেহাবসানে অবিবেকীগণ তথায় গমন করে।

১। কর্মফল সমূহ যেখানে অবলোকিত বা ভুক্ত হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন জন্ম।

জ ন্মা ন্ত র

স্থূলাণি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর ৫।১২

দেহী নিজের (সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক) ভাবানুযায়ী যে শুভাশুভ কর্ম করিয়া থাকেন তাহার ফলে, এবং স্বীয় অন্তঃকরণের ভাবানুযায়ী, স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি নানাপ্রকার দেহ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার এই নানাপ্রকার দেহের সংযোগের অপর কারণও (অর্থাৎ পূর্ব-সংস্কার) পাওয়া যায়।

আত্মন এব প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ শরীরে ॥

প্রশ্ন ৩।৩

এই প্রাণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন। মানব-দেহের সঙ্গে যেমন (অলীক) ছায়া বর্তমান, সেইরূপ এই পরমেশ্বরে এই প্রাণ নামক বস্তু (ছায়ারই ন্যায়) অর্পিত রহিয়াছে এবং মনের সংকল্প ও ক্রিয়াদি অনুসারে ইহা এই শরীরে প্রবেশ করে।

আত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম

যে বস্তু সসীম তাহাই কোনস্থানে অসীম হয় ইহা দেখা যায়। পরিমাণকে এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। পরিমাণ সর্বত্র সীমিত হইলেও আকাশে উহা অসীম। সুতরাং জ্ঞান সাধারণতঃ সসীম হইলেও কোন একটি ক্ষেত্রে উহা অসীম হইবেই। ঐ অসীম জ্ঞানস্বরূপ যিনি তিনিই ব্রহ্ম। অস্তিত্ব বা সত্তা এবং আনন্দ সম্বন্ধেও এই যুক্তি সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং অসীম সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম—ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অবিদ্যারূপ উপাধির প্রভাবে ব্রহ্ম অসীম হইয়াও সসীমের মত প্রতিভাত হয় এবং ঐ সসীম অবস্থাকে গ্রহণ করিয়াই 'আমি', 'তুমি' প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড রূপে বস্তুকে আমরা বুঝিয়া থাকি। প্রকৃত দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন কিছুরই বাস্তব সত্তা নাই। এই জন্যই অদ্বৈত-বেদান্ত "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

কঠ ১।২।২০

সূক্ষ্ম হইতে আরো সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহীয়ান্ এই আত্মা প্রত্যেক প্রাণীর হৃদ্-গুহায় অবস্থিত। কামনারহিত বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এই আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করেন এবং শোকাতীত হন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কঠ ১।২।১৮

ব্রহ্ম জন্মান না, তাঁহার মৃত্যুও নাই। তিনি অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন্ না। ইঁহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় না। ইনি জন্মহীন, চিরস্থায়ী, অবিনাশী এবং পরিবর্তনরহিত। শরীরের নাশে তাঁহার নাশ হয় না।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

কঠ ১।২।১৯

ঘাতক যদি মনে করে সে হত্যা করিবে, নিহত ব্যক্তি যদি মনে করে যে সে হত হইল, তবে তাহারা উভয়েই জানে না যে, আত্মা হত্যাও করেন না, হতও হন না।

মঘবন্মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥

ছান্দোগ্য ৮।১২।১

(ব্রহ্মা বলিলেন) "হে ইন্দ্র, এই দেহ মরণশীল, ইহা মৃত্যুর অধীন ; অবিনাশী অশরীরী আত্মার ইহা অধিষ্ঠান। শরীরাভিমানী জীব সুখদুঃখভোক্তা হন। দেহে আমি-বুদ্ধিযুক্ত জীবের সুখদুঃখের বিরতি নাই। দেহাভিমানরহিত আত্মাকে সুখদুঃখ স্পর্শ করে না।"

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।১৯

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।২০

চর্মকে সঙ্কুচিত করিয়া যেমন কেহই আকাশকে আবৃত করিতে পারে না, সেইরূপ নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিন্দ্য, নিরঞ্জন, মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় ও ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় সকল উপাধিবর্জিত জ্যোতির্ময়কে (ব্রহ্মকে) না জানিয়া দুঃখের চরম অবসান ঘটানো কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ॥

ছান্দোগ্য ৮।৪।১

যিনি আত্মা তিনি সেতুরূপে এই সব লোককে ধরিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে ইহারা বিচ্ছিন্ন না হয়। কি দিবা কি রাত্রি, কি জরা কি মৃত্যু,

কি শুভ কর্ম কি অশুভ কর্ম, কিছুই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। সকল পাপ ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়; কারণ এই ব্রহ্মলোক সকল পাপের অতীত।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥

মুণ্ডক ২।২।১

সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হৃদয়বাসী নামে উক্ত। তিনিই একমাত্র আশ্রয়; (কারণ) তাঁহাতে সচল বিহঙ্গমাদি, প্রাণাদিযুক্ত মনুষ্য প্রভৃতি ও নিমেষযুক্ত এবং নিমেষশূন্য যাহা কিছু আছে সেই সমস্তই সমর্পিত। এই যিনি জীবগণের জ্ঞানের অতীত, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় স্বরূপ, পূজ্য ও শ্রেষ্ঠতম, তাঁহাকে জান।

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥

মুণ্ডকং ২।২।২

যিনি দীপ্তিমান্, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং স্থূল হইতেও স্থূলতর, যাঁহাতে লোকসমূহ এবং তাহাদের অধিবাসীগণ স্থিত, তিনিই এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ; বাক্ এবং মনও তিনিই; তিনিই

সত্য ; তিনিই অমৃতস্বরূপ। হে সৌম্য, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। তাঁহাকে জান।

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।১

সর্বভূতের মধু এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর মধু সর্বভূত। যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, যিনি শরীরে আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

ইমা আপঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।২

এই জল সকল ভূতের মধু, ভূতসমূহ এই জলের মধু। এই জলে যিনি অমৃতময়, তেজোময় পুরুষ, শুক্রে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

অয়মগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।৩

এই অগ্নি সকল ভূতের মধু, ভূতসমূহ এই অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।৪

এই বায়ু সকল ভূতের মধু, ভূতসমূহ এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং

চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।৫

এই আদিত্য সকল ভূতের মধু, ভূত সমূহ এই আদিত্যের মধু। এই আদিত্যে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

ইমা দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসাং দিশাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।৬

এই দিক্‌সমূহ সকল ভূতের মধু, ভূতসমূহ এই দিক্ সকলের মধু। এই দিক্ সমূহে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।৭

এই চন্দ্র সকল ভূতের মধু, ভূতসমূহ এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃত-মিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।৮

এই বিদ্যুৎ সকল ভূতের মধু, ভূতসমূহ এই বিদ্যুতের মধু। এই বিদ্যুতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।৯

এই মেঘগর্জন সকল ভূতের মধু, ভূত সকল এই মেঘগর্জনের মধু। এই মেঘগর্জনে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে

তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।১০

এই আকাশ সকল ভূতের মধু, ভূত সকল এই আকাশের মধু। এই আকাশে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্মস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ ধর্মে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং ধার্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।১১

এই ধর্ম সকল ভূতের মধু, ভূত সকল এই ধর্মের মধু। এই ধর্মে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।১২

এই সত্য (অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান, আচাররূপ ধর্ম) সকল ভূতের মধু, ভূতসকল এই সত্যের মধু। এই সত্যে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ মানুষে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।১৩

এই মনুষ্যজাতি সকল ভূতের মধু, ভূত সকল এই মনুষ্যজাতির মধু[১]। এই মনুষ্যজাতিতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে যিনি আত্মারূপে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

১। মনুষ্যজাতি শব্দে এখানে সকল জীব-জাতিকেই বুঝিতে হইবে। ধর্মের দ্বারা পরিচালিত দেহেন্দ্রিয় সমষ্টি বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে মনুষ্যাদি জাতি-বিশিষ্ট হইয়াই বিভিন্ন প্রাণী পরস্পরের উপকারক হয়।

অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।১৪

এই আত্মা (অর্থাৎ মানুষাদি-জাতি-বিশিষ্ট এবং সর্বভূত ও দেবতাগণ বিশিষ্ট এই বিরাট দেহ) সকল ভূতের মধু, ভূত সকল ইহার মধু। উক্ত বিরাট দেহে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, শরীরে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষরূপী এই যে (বিজ্ঞানময়) আত্মা (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ)— ইনিও সেই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃতস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।১৫

যাহা কিছু আছে সেই সকলের অধিপতি এই আত্মা। তিনিই সকলের রাজা। রথচক্রের নাভি ও পরিধিতে যেরূপ চক্রশলাকা-মাত্রই সংযোজিত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মাতে সকল প্রাণী, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল ইন্দ্রিয় এবং এই সমস্ত জীবাত্মা সংযুক্ত রহিয়াছে।

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈত ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবা-নন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥

বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩২

যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাটকে উপদেশ করিলেন—তিনিই সলিল (জলের ন্যায় স্বচ্ছ)। তিনি একক, সাক্ষী এবং দ্বিতীয়হীন। তিনিই ব্রহ্মরূপ লোক, জীবের পরম গতি, পরম বিভূতি, শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এবং পরম আনন্দ। অপর জীবগণ এই আনন্দেরই অংশাবলম্বনে জীবন ধারণ করে।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥

বৃহদারণ্যক ৪।৪।২০

তিনি অজ্ঞেয়, ধ্রুব। তাঁহাকে একই ভাবে দর্শন করিতে হইবে। এই আত্মা নিষ্পাপ, মূল প্রকৃতিরও অতীত, জন্মরহিত, মহৎ ও অবিনাশী।[১]

১। অপ্রমেয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞেয়, কিন্তু শ্রুতি হইতে জ্ঞেয়। শ্রুতিও কিন্তু সাক্ষাৎভাবে স্বর্গাদি বিষয়ের ন্যায় ব্রহ্মোপদেশ দেন না, পরন্তু জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান প্রভৃতি নিষেধের দ্বারাই (২।৪।১৪) "নেতি" মুখে পরব্রহ্মের নির্দেশ করেন। সুতরাং "অপ্রমেয়" অথচ "অনুদ্রষ্টব্য" এইরূপ বলা অযৌক্তিক নহে। ব্রহ্মে আত্মভাব করা, অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে আত্মভাব ত্যাগ করাই, ব্রহ্মজ্ঞান।

…ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্॥

বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

কোন বস্তুই সেই বস্তুর জন্য প্রিয় হয় না। আত্মার জন্যই বস্তুসকল প্রিয় হয়।[১] হে প্রিয়ে, আত্মার দর্শনলাভেই যত্নবান্ হওয়া উচিত। তাঁহার বিষয়ে শ্রবণ করা, তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করা এবং তাঁহার বিষয়েই ধ্যান করা সঙ্গত। হে মৈত্রেয়ি, একমাত্র আত্মার দর্শনলাভ হইলে, তাঁহার বিষয়ে শ্রবণ করিতে পারিলে, তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিলে, তাঁহাকে জানিতে পারিলে, এই সকলই জানা হইয়া যায়।

১। বস্তুর ভিতর আনন্দময় আত্মা নিহিত আছেন বলিয়াই বস্তু আমাদের প্রিয়।

বিদ্যা, জ্ঞান ও জ্ঞানের ফল

বস্তুর যথার্থ স্বরূপ যে জ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশিত হয় উহাই বিদ্যা বা যথার্থ জ্ঞান-পদবাচ্য। সুখ লাভ ও দুঃখ পরিহারের ইচ্ছায়ই মানুষ সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুর যথার্থ স্বরূপ লাভ হইলেই সেই প্রবৃত্তি সার্থক হয়। জ্ঞানের সাহায্যে প্রথমতঃ আমরা বস্তুর সহিত পরিচিত হই। তাহার পর ঐ বস্তু অনুকূল বা প্রতিকূল ইহা স্থির করিয়া বস্তু গ্রহণ বা বর্জনের জন্য চেষ্টিত হই। সুতরাং জ্ঞানের সাহায্যে যদি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত না হয় তাহা হইলে জ্ঞানোদ্দিষ্ট বস্তুর গ্রহণ বা বর্জন প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নহে। অতএব জীবনের চরম উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যাহা মূল তাহাই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞান বা বিদ্যা। অবিদ্যা বা অজ্ঞান প্রতিপদেই জীবনের প্রসারণ-বিরোধী হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ অবিদ্যার নাশক হিসাবে বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান জীবনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে পরম সহায়। লৌকিক প্রত্যক্ষাদির অনধিগম্য সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দেশক হিসাবে উপনিষদ-প্রতিপাদ্য জ্ঞান এইজন্যই একান্ত প্রয়োজন।

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৫।১

যাহা কিছু বিনাশশীল তাহাই অজ্ঞান (অবিদ্যা) ; আর যাহা কিছু

অবিনাশী তাহাই জ্ঞান (বিদ্যা)। এই জ্ঞান এবং অজ্ঞান যে অনন্ত ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে নিহিত আছে এবং যাঁহার দ্বারা এই অবিদ্যা ও বিদ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় তিনি কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার।[১]

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥

মুণ্ডক ২।২।৩

হে সৌম্য, উপনিষদোক্ত (ওঁকারস্বরূপ) মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উহাতে গভীর মননের দ্বারা সুশাণিত তীর[২] সন্ধান করিবে ; ব্রহ্মধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ধনু আকর্ষণ-পূর্বক পরব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে অক্ষরকে ভেদ করিবে।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

মুণ্ডক ২।২।৪

১। উপনিষদের মতে স্বপ্রকাশ নিত্য ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপ (তৈত্তিরীয় ২।১।৩)। অনাদি অবিদ্যা একমাত্র এইরূপ যথার্থ জ্ঞানের দ্বারাই বিনষ্ট হয়। সাধারণ লৌকিক জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার ভিতরে দুইটি অংশ আছে—একটি বিষয়াংশ, একটি প্রকাশাংশ। ঐ প্রকাশাংশই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান, বিষয়াংশ কল্পিত মাত্র। সুতরাং সমস্ত জ্ঞানের বিষয়াংশকে জ্ঞান হইতে পৃথক করিলে যাহা থাকে, তাহা এক, নিত্য এবং সত্যস্বরূপ।

২। "প্রণব সহায়ে যে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব স্ফুরিত হয়, তাহাই আত্মা"—এইরূপ চিন্তার নাম প্রণবে শরসন্ধান। এই চিৎপ্রতিবিম্বের সহিত বিম্বভূত ব্রহ্মের ঐক্যসন্ধানই লক্ষ্যভেদ। এইরূপ চিন্তায় অসমর্থ হইলে ওঁ প্রতীকেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে।

ওঙ্কার ধনু, জীবাত্মা তীর এবং ব্রহ্মই লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হইয়া এই লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। তাহা হইলেই তীর এবং লক্ষ্য যেরূপ সংযুক্ত হয় তদ্রূপ হইবে।

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

মুণ্ডক ২।২।৫

যাঁহাতে দেবলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়সহ মন অর্পিত রহিয়াছে সেই একমাত্র আত্মাকেই জান। অপর সকল বাক্য পরিত্যাগ কর। ইহাই অমৃতত্ব লাভের উপায়।

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ॥

মুণ্ডক ২।২।৬

যেরূপ চক্রশলাকাসমূহ রথচক্রের নাভিতে যুক্ত থাকে সেইরূপ যে হৃদয়ে নাড়িসমূহ প্রবিষ্ট আছে উক্ত পুরুষ সেই হৃদয়মধ্যে বহুভাবে অনুভূত হন। সেই আত্মাকে ওঁকাররূপে ধ্যান কর। অজ্ঞানের পারে গমনেচ্ছু তোমাদের মঙ্গল হউক।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

মুণ্ডক ২।২।৭

যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্ এবং যাঁহার মহিমা বিশ্বব্যাপী সেই আত্মাই আত্মার আবাসস্থল জ্যোতির্ময় হৃদয়াকাশে অবস্থিত।

যিনি মনোময় এবং প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরের চালক, তিনি স্থূল শরীরে হৃদয়ে আনন্দস্বরূপে অবস্থিত বলিয়া প্রকটিত হন। তাঁহাকে (সেই আত্মাকে) বিবেকীগণ বিশেষ জ্ঞান সহায়ে সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ॥

মুণ্ডক ৩।২।১

সমগ্র বিশ্ব যাঁহাতে নিহিত এবং যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশমান সেই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে তিনি (ব্রহ্মজ্ঞ) জানেন। সকল কামনা রহিত যে সকল ধীমান ব্যক্তি (এইরূপ) ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন তাঁহাদের আর জন্ম হয় না।

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।১০

জগৎ এবং জগতের কারণ হইতে যিনি ঊর্ধ্বে, তিনি অরূপ এবং সকল গ্লানিশূন্য। এই তত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমর হন। আর যাহারা তাহা জানে না তাহারা দুঃখভোগ করে।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।১৪

সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, (সংসাররূপ) মহারণ্যের মধ্যে অবস্থিত, যিনি জগতের স্রষ্টা, বহুরূপে প্রকাশমান এবং সমগ্র বিশ্বের একমাত্র পরিব্যাপক, মঙ্গলময় তাঁহাকে জানিলে পরাশান্তি লাভ হয়।

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।১৫

যথাকালে (কল্পারম্ভে) তিনিই বিশ্বের রক্ষক, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়া সাক্ষীরূপে সকল প্রাণীর অন্তরে অবস্থান করেন। ব্রহ্মর্ষিগণ এবং দেবগণ যে পরব্রহ্মে যুক্ত হইয়া আছেন তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু-পাশ ছিন্ন হয়।

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।১৬

ঘৃতের উপরে সরের ন্যায় অতি মনোরম এবং সূক্ষ্ম, সর্বভূতের হৃদয়স্থ মঙ্গলময় সমগ্র বিশ্বের একমাত্র আবরক পরমদেবকে জানিলে জীবের সকল বন্ধন মোচন হয়।

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।১৭

জ্যোতির্ময়, নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, সর্বব্যাপী ইনি সর্বদা জীবগণের হৃদয়াভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। ইনি অজ্ঞাননাশক বিবেক ও অভেদ-জ্ঞান সহায়ে অভিব্যক্ত হন। ইঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥

কেন ২।৪

প্রতি প্রত্যয়ে বুদ্ধি যখন আত্মারূপে প্রতীত হন তখনই ঠিক জ্ঞান হইল। কারণ এই জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়। আত্মার দ্বারা বীর্য লাভ হয় এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়।

যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্মানমনন্তে
স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥

কেন ৪।৯

এই ব্রহ্মবিদ্যাকে যিনি এই প্রকারে লাভ করেন তাঁহার সকল পাপ (কর্মফল) নিঃশেষিত হয় এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম স্বর্গলোকে[১] (অর্থাৎ পরব্রহ্মে) সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥

কঠ ২।২।১২

যিনি এক, সমস্তই যাঁহার অধীন, যিনি সকলের অন্তরাত্মা এবং

১। স্বর্গ শব্দটি সাধারণ অর্থে, অর্থাৎ দেবলোক অর্থে গৃহীত হইতে পারে না; কারণ দেবলোক সর্বমহত্তম বা অনন্ত নহে। স্বর্গ বিনাশী; ব্রহ্মই অপর সকল অপেক্ষা মহৎ।

এক রূপকে যিনি বহুভাবে ব্যক্ত করেন সেই আত্মস্থ পরমাত্মাকে যাঁহারা দর্শন করেন তাঁহারা অনন্ত সুখের অধিকারী হন, অপরে নহে।[১]

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

কঠ ২।২।১৩

যিনি সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তুর মধ্যে (একমাত্র) অবিনশ্বর, সচেতন-দিগের যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি একক হইয়াও সকল প্রাণীর কর্মফল বিধান করেন, হৃদ্‌গুহায় অবস্থিত, তাঁহার দর্শন যে সকল বিবেকীগণ লাভ করেন তাঁহারা চিরশান্তির অধিকারী হন, অপরে নহে।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥

কঠ ২।৩।৮

সর্বব্যাপী এবং অননুমেয় যে পরমাত্মাকে জানিয়া জীবগণ বন্ধন-মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে তিনি মূল প্রকৃতিরও অতীত।

১। পরাধীনতা এবং অপরের অপেক্ষা অল্প গুণবত্তা প্রভৃতিই দুঃখের কারণ হয়। ব্রহ্ম সর্বেশ্বর এবং দ্বিতীয়শূন্য বলিয়া তাঁহাতে দুঃখের অবকাশ নাই। অতএব তাঁহার প্রাপ্তিই আনন্দরূপ পরম পুরুষার্থ।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ, সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে—এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।...

প্রশ্ন ৬।৫

সমুদ্রাভিমুখে প্রবহমান নদীসমূহ যেমন সমুদ্রেই প্রবেশ করিয়া মিলাইয়া যায়, তাহাদের নাম বা রূপ কিছুই থাকে না এবং তাহারা সমুদ্র নামেই অভিহিত হয়—সেইরূপ বিজ্ঞানীর ব্রহ্মাবগাহী প্রাণাদি ষোড়শকলাও ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই লীন হইয়া যায়, তাহাদেরও নামরূপ থাকে না। সেই বিজ্ঞানী তখন কেবল 'পুরুষ' এই নামেই উক্ত হন। এইরূপ বিদ্বান কালাতীত ও অবিনাশী।

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। নাতঃ পরমস্তীতি॥

প্রশ্ন ৬।৭

তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এই পর্যন্ত। ইহার অধিক আর কিছু জানিবারও নাই।

জীবন্মুক্তি

সমস্ত কর্ম তিনভাগে বিভক্ত—সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মান। যে সমস্ত কর্ম সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, অথচ উহার কোন ফল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই সঞ্চিত কর্ম। যে কর্মসমূহের ফলভোগ করিবার জন্য এই স্থূলদেহ-গ্রহণরূপ জন্ম হইয়াছে উহাই প্রারব্ধ। আর বর্ত্তমান জন্মে যে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া ভবিষ্যতে ফলদান করিবে তাহাই ক্রিয়মান কর্ম। এই ত্রিবিধ কর্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়াই মানব জন্মমরণরূপ সংসার-চক্রে আবর্তিত হইতেছে। তত্ত্ব-জ্ঞানের সাহায্যে অবিদ্যা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে অবিদ্যামূলক সঞ্চিত কর্মসমূহ দগ্ধ-বীজের মতই অসার হইয়া যায় এবং ক্রিয়মান কর্মও ভবিষ্যতে ফলদায়ক হইতে পারে না। এই অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ প্রারব্ধ কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া বিদ্যমান থাকেন। যোগীর এই অবস্থাই জীবন্মুক্তি নামে অভিহিত হয়।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥

মুণ্ডক ৩।১।৯

জীবগণের ইন্দ্রিয়সমূহ এবং প্রাণ আত্মা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই আত্মা নিজেকে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। যে

দেহে প্রাণ পঞ্চপ্রকারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে সেই দেহ মধ্যেই নির্মল চিত্তের দ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে।[১]

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥

মুণ্ডক ৩।২।২

বিষয়ের অনুধ্যান করিয়া যিনি বিষয় কামনা করেন তিনি বাসনা সমূহ দ্বারা সেই সকল স্থানে (কাম্য বিষয়ের মধ্যে) জন্মলাভ করেন। আর যিনি পূর্ণকাম, তিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ; তাঁহার সকল বাসনা ইহজীবনেই লোপ পায়।

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥

মুণ্ডক ৩।২।৫

১। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় বা কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে সর্বত্র অনুস্যূত আছেন ; তথাপি চিত্তেই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ এবং চিত্তবৃত্তি দ্বারাই ইন্দ্রিয়াদির বিষয় অভিব্যাপ্তিত হয়। এই জন্যই লোকে চিত্তকে চেতন বলিয়া ভ্রম করে। এই চিত্ত নির্মল হইলে যোগিগণ উহাতে ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধি প্রাপ্ত হন।

ঋষিগণ এই আত্মাকে সম্যকরূপে জানিয়া এই আত্মজ্ঞানেই পরিতৃপ্ত, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, আসক্তিশূন্য এবং নির্বিকার হন। সেই সমাহিতচিত্ত ধীর ব্যক্তিগণ সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্বত্র লাভ করিয়া (অন্তে) এই সর্বস্বরূপেই প্রবেশ করেন।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥

মুণ্ডক ৩।২।৬

বেদান্ত-বিজ্ঞানের তাৎপর্য যাঁহাদের নিকট পরিস্ফুট, সন্ন্যাসযোগ সহায়ে যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, সেই যতিগণ (জীবিত কালেই) ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞানজনিত পরমানন্দ লাভ করেন এবং অন্তকালে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।[১]

১। সাধারণ লোকের দেহত্যাগ 'পর অন্তকাল' নহে, কারণ তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মুক্ত পুরুষ অন্যত্র গমন করেন না। ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে একীভূত হয়, তিনিও সেইরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন হন।

মোক্ষ

সমস্ত দুঃখের চিরনিবৃত্তি অথবা অনাবিল চির আনন্দলাভই সমগ্র প্রাণী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ঐ উদ্দেশ্যকে মূল কেন্দ্র করিয়া জীব-সমাজ প্রতিটি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অথচ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও দুঃখের চিরনিবৃত্তি অথবা একান্ত সুখলাভ জীবের পক্ষে সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। পরম সুখকর মনে করিয়া মানুষ যাহা গ্রহণ করে বিনশ্বর বস্তুর ক্ষণভঙ্গুরতার ফলে গৃহীত সেই বস্তুটি নিজেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়াও তদপেক্ষা অধিক সুখের আশায় মানবের অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠে। বিশ্ব-প্রকৃতিকে নিজের সুখলাভের অনুকূল রূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ এই সীমিত পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আজ অসীম মহাকাশ জয়ের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরাম ঘটে নাই। মানুষ সুখের সন্ধানে উল্কার মত ছুটিয়াই চলিয়াছে। একমাত্র স্থির সত্য বস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই মানবের সমস্ত চাওয়া এবং পাওয়ার চরম নিবৃত্তি ঘটে। ঐ অবস্থাই শাস্ত্রে মোক্ষ নামে অভিহিত।

মো ক্ষ লা ভে র উ পা য়

ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি॥

ছান্দোগ্য ২।২৩।১

ধর্মের অঙ্গ তিনটি। প্রথম অঙ্গ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। দ্বিতীয় অঙ্গ তপস্যা। কৃচ্ছ্রসাধনরত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে আজীবন গুরুগৃহে বাসই তৃতীয় অঙ্গ। এই তিন উপায়েই পুণ্যলোক লাভ হয়। আর যিনি ব্রহ্মোপাসক তাঁহার কিন্তু অমৃতত্ব লাভ হয়।

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥

মুণ্ডক ১।২।১১

যে সমস্ত ভিক্ষাবৃত্ত বাণপ্রস্থাশ্রমী ও সন্ন্যাসী অরণ্যে অবস্থানপূর্বক এবং যে সমস্ত শান্তচিত্ত সদসদ্-বিচারশীল গৃহস্থ শ্রদ্ধাসহকারে নিজ নিজ আশ্রমোচিত উপাসনায় রত থাকেন তাঁহাদের সকল কর্ম ক্ষয় হয় এবং তাঁহারা উত্তরায়ণ মার্গে অবিনাশী অক্ষর হিরণ্যগর্ভের লোকে গমন করেন।

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ২।১৫

হৃদ্গুহাস্থ দীপশিখার ন্যায় নিজ আত্মার সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব যে অভিন্ন, তাহা যখন সাধক অপরোক্ষভাবে বোধ করেন, তখনই তিনি জন্মরহিত,

নিত্য, সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ পরমাত্মাকে জানিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।১

যিনি একক, মায়াশক্তিযুক্ত, স্বীয় শক্তিসমূহ সহায়ে শাসন করেন, যিনি এক হইয়াও স্বীয় শক্তিদ্বারা অভ্যুদয় ও উৎপত্তিকালে সমুদয় প্রাণীকে নিয়ন্ত্রিত করেন, (তাঁহার) এই তত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর ২।১৪

মৃত্তিকা-পিণ্ড সংযোগে বিমলিন স্বর্ণাদি যেমন অগ্নিদ্বারা শোধিত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেরূপ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়া যোগী পরমাত্মার সহিত এক, কৃতকৃতার্থ ও শোকরহিত হন।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

কেন ২।৫

এই জীবনেই যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন। কিন্তু যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহার মহাসঙ্কট। বিবেকীগণ প্রতি প্রাণীতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া এই সংসার হইতে বিরত হন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন।

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।২১

ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে জন্মরহিত বলিয়া থাকেন, এবং যাঁহাকে তাঁহারা নিত্য বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই জরাদিরহিত, পুরাতন, সকলের আত্মভূত এবং পরিব্যাপক বলিয়া সর্বত্র বিরাজমান ব্রহ্মকে আমি জানি।

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥

বৃহদারণ্যক ৪।৪।১২

"ইনিই আমি"—এইরূপে যদি কোন ব্যক্তি পরমাত্মাকে জানেন তবে তিনি কিসের আকাঙ্ক্ষায়, কোন্ প্রয়োজনে আবার শরীরের কষ্টে দুঃখভোগ করিবেন ?[১]

ওঁ ॥

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

[তিনি পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন।]

১। তিনি সর্বাত্মক হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিতে ভোগ্যবস্তু নাই, ভোক্তাও নাই। সুতরাং দেহোপাধিজনিত দুঃখভোগও নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

জীবের অবস্থাভেদ

১। মানুষ—যেমন বালিশের খোল; বালিশের ওপর দেখতে কোনটা লাল, কোনটা কাল; কিন্তু সকলের ভেতরে সেই একই তুলো। মানুষ দেখতে কেউ সুন্দর, কেউ কাল; কেউ সাধু, কেউ অসাধু; কিন্তু সকলের ভেতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।

২। সংসারে দুরকম স্বভাবের লোক দেখতে পাওয়া যায়—কতকগুলো কুলোর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট, আর কতকগুলো চালুনির ন্যায়। কুলো যেমন ভুষি প্রভৃতি অসার বস্তু সব পরিত্যাগ করে সার বস্তু যে শস্য সেইগুলি আপনার ভেতর রাখে, সেই রকম কতকগুলি লোক সংসারের অসার বস্তু (কামকাঞ্চনাদি) পরিত্যাগ করে সার বস্তু ভগবানকে গ্রহণ করে। চালুনি যেমন সার বস্তুসকল পরিত্যাগ করে অসার বস্তুগুলি নিজের ভেতর রাখে, সেইরূপ সংসারের কতকগুলি লোক সার বস্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে অসার বস্তু কামকাঞ্চনাদি গ্রহণ করে।

৩। সব জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করা যায় না। সকল স্থানে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় যাওয়া যায় না। যেমন কোন জলে পা ধোয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া যায়, কোন জল বা খাওয়া যায়, আবার কোন কোন জল ছোঁওয়া পর্যন্ত যায় না, তেমনি কোন কোন জায়গায় যাওয়া যায় ও কোন জায়গায় দূরে থেকে গড় করে পালাতে হয়।

৪। গুরু এক শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বললেন, সকল পদার্থই নারায়ণ; শিষ্য তাই বুঝলেন। একদিন পথের মধ্যে একটা হাতী

আসছিল, ওপর হতে মাহুত বললে, "সরে যাও।" শিষ্য ভাবলে, "আমি সরে যাব কেন ? আমিও নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ, নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি ?" সে সরল না। শেষে হাতী শুঁড়ে করে তাকে দূরে ফেলে দিলে, তাতে তার বড় ব্যথা লাগল। পরে সে গুরুর কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানালে, গুরু বললেন, "ভাল বলেছ—তুমি নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ; কিন্তু ওপর থেকে মাহুতরূপে নারায়ণ তোমাকে সাবধান হতে বলেছিলেন, তুমি মাহুত-নারায়ণের কথা শুনলে না কেন ?"

ধর্ম উপলব্ধির বস্তু

১। শাস্ত্রবিচার কতদিন দরকার, জান ? যতদিন না সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকার হন। যেমন ভ্রমর যতক্ষণ না ফুলে বসে ততক্ষণ গুন্ গুন্ করতে থাকে, আর যখন ফুলের উপর বসে মধুপান করতে থাকে, তখন একেবারে চুপ—কোনও শব্দ করে না।

২। একদিন স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস-দেবের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানলাভ হয় না কেন ?" পরমহংসদেব উত্তরে বললেন "যেমন চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে ওড়ে কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে ? তাদের মন সর্বদা কাম-কাঞ্চনে আসক্ত থাকার দরুন জ্ঞানলাভ করতে পারে না।"

৩। যেমন খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলে ভক্ ভক্ করে শব্দ

হয় কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না, তেমনি যার ভগবান-লাভ হয় নি সে-ই ভগবান সম্বন্ধে নানা গোল করে, আর যে তাঁর দর্শনলাভ করেছে সে স্থির হয়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।

৪। বিবেক-বৈরাগ্য না থাকলে শাস্ত্র পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভও হয় না। এইটি সৎ আর এইটি অসৎ বিচার করে সদ্বস্তু গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা—এইরূপ বিচার-বুদ্ধির নাম বিবেক ; বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।

৫। যেমন হাটের বাহিরে থেকে দাঁড়িয়ে কেবল একটা হো হো শব্দ শোনা যায় কিন্তু যতক্ষণ লোকে ভেতরে প্রবেশ না করে সেই হো হো শব্দ স্পষ্টরূপে বোঝা যায় না, ভেতরে প্রবেশ করে দেখে—কেউ বা দরদস্তুর কচ্ছে, কেউ বা পয়সা দিচ্ছে আর জিনিস কিনছে, ইত্যাদি, তেমনি ধর্মজগতের বাইরে থেকে ধর্মের ভাব কিছু বুঝতে পারা যায় না।

সংসার ও সাধন

১। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, "সংসারে থেকে ঈশ্বর-উপাসনা কি সম্ভব ?" পরমহংসদেব একটু হেসে বললেন "ও দেশে দেখেছি, সব চিঁড়ে কোটে। একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ভেতর হাত দিয়ে নাড়ছে, আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে, ওর ভেতর আবার খদ্দের আসছে, তার সঙ্গে হিসাব করছে—'তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আছে, আজকের এত দাম হল।' এই রকম সে সব কাজ করছে বটে, কিন্তু তার মন সর্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের

দিকে আছে ; সে জানে যে ঢেঁকিটি হাতে পড়ে গেলে হাতটি জন্মের মত যাবে। সেইরূপ সংসারে থেকে সকল কাজ কর ; কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি। তাঁকে ছাড়লে সব অনর্থ ঘটবে।"

২। সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন, তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীরপুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্য দিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেমনি এ সংসারের বোঝা ঘাড়ে করে ভগবানের পানে চেয়ে থাকে।

৩। নির্লিপ্তভাবে সংসার করা কি রকম জান ? পাঁকাল মাছের মতন। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না।

৪। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার ভেতর যেন জল না ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধকের মনের ভেতর যেন সংসারভাব না থাকে।

৫। যেমন কাঁঠাল ভাঙ্গতে গেলে লোকে আগে বেশ করে হাতে তেল মেখে নেয়, তা হলে আর হাতে কাঁঠালের আঠা লাগে না, তেমনি এই সংসাররূপ কাঁঠালকে যদি জ্ঞানরূপ তেল হাতে মেখে সম্ভোগ করা যায়, তা হলে কামিনীকাঞ্চনরূপ আঠার দাগ আর মনে লাগতে পারবে না।

৬। জ্ঞানলাভ হলে তারা সংসারে কি রকম ভাবে থাকে, জান ? যেমন সার্সির ঘরে বসে থাকলে ভেতরের ও বাহিরের—দুই-ই দেখতে পায়।

৭। ভক্ত কেশবচন্দ্রকে দেখবার ঠাকুরের বড় সাধ হয়েছিল। তখন কেশববাবু ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে ৺জয়গোপাল সেনের বেলঘরের

বাগানে অবস্থান করছিলেন। ঠাকুর হৃদয় মুখুজ্যেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী করে বেলঘরের বাগানে উপস্থিত হলেন। কেশববাবু তখন ব্রাহ্ম-ভক্তদের সঙ্গে পুকুরে স্নান করবার উদ্যোগ করছেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন, "এরই ল্যাজ খসেছে।" এই শুনে ব্রাহ্মভক্তেরা সকলে হেসে উঠলেন। কেশববাবু তাঁদের বললেন, "তোমরা হেসো না; ইনি যা বলছেন তার মানে আছে।" ঠাকুর তখন বললেন, "ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে ততদিন জলে থাকে; ল্যাজ খসে গেলে জলেও থাকতে পারে ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। তেমনি ভগবানকে চিন্তা করে যার অবিদ্যা দূর হয়ে গেছে, সে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে থাকতেও পারে, আবার সংসারেও থাকতে পারে।"

৮। ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট বসে যে যা-কিছু প্রার্থনা করে তাই তার লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধনভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়।—কেমন জান ?—

এক ব্যক্তি কোন সময় ভ্রমণ করতে করতে অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়। পথে রৌদ্রের তাপে এবং পথভ্রমণের ক্লেশে অতিশয় ক্লান্ত ও ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে কোন এক বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করে শ্রান্তি দূর করতে করতে মনে মনে ভাবলে যে, এই সময়ে যদি একটি উত্তম শয্যা মেলে তাহলে তাতে অতি সুখে নিদ্রা যাই। পথিক যে কল্পতরুর নিম্নে বসেছিল তা সে জানত না। মনে মনে যেমন এই বাসনা উঠল তৎক্ষণাৎ সেখানে উত্তম শয্যা এসে পড়ল। পথিক অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাইতেই শয়ন করলে ও মনে মনে ভাবতে লাগলে—এই সময় যদি একটি স্ত্রীলোক এসে আমার পদসেবা করে

তাহলে অতি সুখে শয়ন করতে পারি। এই সঙ্কল্প হতে না হতেই তখনই এক যুবতী পথিকের পদতলে এসে উপবেশন পূর্বক তার সেবা করতে লাগল। পথিকের এই দেখে আহ্লাদের আর সীমা রইল না। তারপর তার খুব ক্ষুধা পেতে লাগল ও সে মনে করলে যা ইচ্ছা করেছিলুম তা ত পেলুম, তবে কি কিছু খাবার জিনিস পাব না? বলতে না বলতে তার নিকট অমনি নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য এসে জুটল। পথিক সেগুলি দিয়ে তখনই উদর পূর্ণ করে সেই শয্যায় শয়নপূর্বক সেদিনকার সব ঘটনা ভাবছে; এমন সময় তার মনে হল যে এ সময় যদি হঠাৎ একটা বাঘ এসে পড়ে, তা হলেই বা কি করা যায়। যেমন এইটি মনে হওয়া অমনি এক প্রকাণ্ড বাঘ লাফ দিয়ে এসে তাকে ধরল এবং তার ঘাড় থেকে রক্ত পান করতে লাগল। অবশেষে পথিকের জীবন শেষ হল। এই সংসারে জীবেরও ঠিক এইরূপ দশা ঘটে থাকে। ঈশ্বরসাধন করতে গিয়ে বিষয়, ধন, জন অথবা মান, যশ ইত্যাদির কামনা করলে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে কিন্তু শেষে ব্যাঘ্রেরও ভয় থাকে; অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, নিন্দা, অপমান ও বিষয়নাশরূপ ব্যাঘ্র স্বাভাবিক ব্যাঘ্র হতেও লক্ষগুণে যন্ত্রণাদায়ক।

৯। এক ব্যক্তির মনে হঠাৎ বৈরাগ্যভাব উদয় হতে আত্মীয়-ভাইদের নিকট বলল, "সংসার আমার ভাল লাগছে না। এখনি আমি কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর-আরাধনা করব।" তার আত্মীয়েরা এই শুভ সঙ্কল্পে সম্মতি দিল। উক্ত ব্যক্তি বাড়ী হতে বের হয়ে ক্রমে এক নির্জন স্থানে উপস্থিত হয়ে ঘোরতর তপস্যা করতে আরম্ভ করলে। ক্রমান্বয়ে বার বৎসর কাল তপস্যা করে ও কিছু কিছু সিদ্ধাই লাভ করে পুনরায় বাড়ীতে ফিরল। তার আত্মীয়-স্বজনেরা

অনেকদিন পরে তাকে দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল ও কথাবার্তা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "এতদিন তপস্যা করে কি জ্ঞান লাভ করলে?" তখন সেই ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করে সম্মুখে একটি হাতী চলে যাচ্ছে দেখে হাতীর নিকট গিয়ে তার গা তিনবার স্পর্শ করে যেমন বললে, "হাতী, তুই মরে যা", অমনি হাতীটা তার স্পর্শে মৃতবৎ হয়ে গেল; কিছুক্ষণ পরে আবার গায়ে হাত দিয়ে যেমন বললে, "হাতী, বাঁচ" অমনি হাতী বেঁচে উঠল।

তারপর বাড়ীর সম্মুখে নদীর ধারে গিয়ে মন্ত্রবলে এপার হতে পরপারে চলে গেল, আবার ঐভাবে নদী পার হয়ে এল। তার ভাইয়েরা এইসব দেখে খুব আশ্চর্য হলো বটে, কিন্তু তপস্বী ভাইকে বলতে লাগল—"ভাই, এতদিন কেবল বৃথা তপস্যা করেছ; হাতী মরল ও বাঁচল তাতে তোমার কি লাভ হল? আর তুমি বার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করে নদী পারাপার করতে শিখেছ, যা আমরা এক পয়সা খরচ করে থাকি। অতএব তুমি কেবল বৃথা সময় নষ্ট করেছ।" ভাইদের নিকট এইরূপ শ্লেষপূর্ণ কথা শুনে তার যথার্থই হুঁশ হল ও সে বলতে লাগল, "যথার্থই আমার নিজের কি হল?" এই বলে তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শনলাভের জন্য পুনরায় ঘোরতর তপস্যা করতে চলে গেল।

১০। ঈশ্বর দুবার হাসেন। যখন ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে জমি বখ্‌রা করে নেয় আর বলে—"এদিকটা আমার ও ঐ দিকটা তোমার" তখন একবার হাসেন। আর একবার হাসেন যখন লোকের কঠিন অসুখ হয়ে পড়েছে, আত্মীয়-স্বজনেরা সকলে কান্নাকাটি কচ্ছে, বৈদ্য এসে বলছে, "ভয় কি? আমি ভাল করে দেব।" বৈদ্য জানে না যে, ঈশ্বর যদি মারেন তবে কার সাধ্য তাকে রক্ষা করে।

১১। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "হে অর্জুন, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধিও থাকলে পরে আমার যে সেই পরমভাব তা তুমি লাভ করতে পারবে না।" অতএব যারা ঠিক ঠিক ভক্ত ও জ্ঞানী, তারা যেন কোনরূপ সিদ্ধি কামনা না করে।

১২। টাকার অহঙ্কার করতে নেই। যদি বল আমি ধনী, ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকী পোকা ওঠে, সে মনে করে—আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি; কিন্তু যেই নক্ষত্র উঠল, অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা মনে করে—আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি; কিন্তু পরে যখন চন্দ্র উঠল তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলে—আমার আলোয় জগৎ হাসছে। দেখতে দেখতে অরুণোদয় হল, তখন চন্দ্র মলিন হয়ে গেল। খানিক পরে আর দেখা গেল না। ধনীরা যদি এগুলি ভাবে, তা হলে আর তাদের ধনের অহঙ্কার থাকে না।

১৩। সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নেই। যে সয়, সে-ই রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটে—শ, ষ, স।

১৪। সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নেই। সকলেরই সহ্যগুণ থাকা চাই। যেমন কামারবাড়ীর নাইয়ের ওপর কত জোর করে বড় বড় হাতুড়ি পেটে তথাপি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, সেইরূপ কূটস্থবৎ বুদ্ধি থাকা চাই—যে যাই বলুক ও যে যাই করুক না কেন, সমুদয় সহ্য করে লবে।

১৫। ধ্যান এমন করবে যে তাতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাবে—ডাইলিউট (dilute) হয়ে যাবে; যখন ঠিক ধ্যান হয়, পাখীরা

তার গায়ে বসে কিন্তু সে টের পায় না। মা কালীর মন্দিরের নাটমন্দিরে আমি যখন বসে ধ্যান করতুম, তখন সেখানকার লোকেরা বলতো, "আপনার গায়ে চড়াই ও শালিক পাখী বসে খেলা করে।"

মায়া

১। মায়ার স্বভাব কেমন জান? যেমন জলের পানা। ঢেইয়ে দিলে সব পানা সরে গেল। আবার একটু পরেই আপনাআপনি পুরে এল। তেমনি যতক্ষণ বিচার কর, সাধুসঙ্গ কর, যেন কিছুই নেই। একটু পরেই বিষয়বাসনা আবরণ করে।

২। সাপের মুখে বিষ আছে; সে যখন আপনি খায় তখন তার বিষ লাগে না, কিন্তু যখন অন্যকে খায়, তখন বিষ লাগে। তেমনি ভগবানের মায়া আছে বটে, কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে না; অন্যকে সে মায়া মুগ্ধ করে।

৩। মায়া কাকে বলে জান?—বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, ভাগ্‌নে, ভাইপো, ভাইঝি এই সব আত্মীয়দের প্রতি যে টান ও ভালবাসা; আর দয়া মানে সর্বভূতে আমার হরি আছেন, এই জেনে সকলকে ভালবাসা।

৪। যাকে ভূতে পায় সে যদি জানতে পারে যে তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হলে ভূত পালিয়ে যায়। 'মায়াচ্ছন্ন জীব যদি একবার ঠিক জানতে পারে যে, তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে, তা হলে মায়া তার নিকট থেকে তখনই পালায়।

৫। জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে এক মায়া-আবরণ আছে; এই মায়া-

আবরণ না সরে গেলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় না। যেমন অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা এবং পশ্চাতে লক্ষ্মণ। এস্থলে রাম পরমাত্মা ও লক্ষ্মণ জীবাত্মাস্বরূপ ; মধ্যে জানকী মায়া-আবরণ হয়ে রয়েছেন। যতক্ষণ মা জানকী মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান না। জানকী একটু সরে পাশ কাটালে তখন লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান।

৬। যেমন সূর্য পৃথিবীকে আলো করে রেখেছেন, কিন্তু সামান্য এক খণ্ড মেঘ সম্মুখে এসে যদি আবরণ করে ফেলে তা হলে আর সূর্য দৃষ্টিগোচর হন না, সেইরূপ সর্বব্যাপী ও সর্বসাক্ষিস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে আমরা সামান্য মায়া-আবরণ বশতঃ দেখতে পাচ্ছি না।

৭। পানাপুকুরে নেবে যদি পানাকে সরিয়ে দাও আবার তখন এসে জোটে ; সেইরকম মায়াকে ঠেলে দিলেও আবার মায়া এসে জোটে। তবে যদি পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে আর বাঁশ ঠেলে আসতে পারে না। সেই রকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞান-ভক্তির বেড়া দিতে পারলে আর মায়া তার ভেতর আসতে পারে না ; সচ্চিদানন্দই কেবলমাত্র প্রকাশ থাকেন।

ঈশ্বর

১। ভগবান সকলকার ভেতর কিরূপে বিরাজ করেন জান? যেমন চিকের ভেতর বড়-লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না ; ভগবান ঠিক সেইরূপে বিরাজ করছেন।

২। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ; ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন,

তখন তাঁকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলে; আর যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি করেন, তখন তাঁর শক্তির কাজ বলে।

৩। সাকার এবং নিরাকার কিরূপ জান? যেমন জল আর বরফ। যখন জল জমাট বেঁধে থাকে তখনই সাকার; আর যখন গলে জল হয় তখনই নিরাকার।

৪। যিনিই হয়েছেন সাকার, তিনিই নিরাকার। ভক্তের কাছে তিনিই সাকাররূপে আবির্ভূত হয়ে দর্শন দেন। যেমন মহাসমুদ্র—কেবল অনন্ত জলরাশি, কূল-কিনারা কিছুই নেই, কেবল কোথাও কোথাও বেশী ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বরফ হয়েছে দেখা যায়। সেইরূপ ভক্তের ভক্তি-হিমে সাকাররূপ দর্শন হয়। আবার সূর্য উঠলে যেমন বরফ গলে যায় ও পূর্বের ন্যায় যেমন জল তেমনি হয়ে থাকে, তেমনি জ্ঞানসূর্য উদিত হলে সেই সাকাররূপ বরফ গলে জল হয়ে যায় ও সব নিরাকার হয়।

আত্মজ্ঞান

১। মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোন জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা আমি?......বিচার করলে 'আমিত্ব' বলে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে তাই আত্মা—চৈতন্য। 'আমার' 'আমিত্ব' দূর হলে ভগবান দেখা দেন।

২। দুই রকম 'আমি' আছে—একটা পাকা 'আমি' আর একটা

কাঁচা। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে—এগুলো কাঁচা 'আমি'; আর পাকা 'আমি' হচ্ছে—আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ।

৩। শরীর থাকতে 'আমার' 'আমিত্ব' একেবারে যায় না, একটু না একটু থেকে যাবেই; যেমন নারিকেল গাছের বাল্‌তো খসে যায় কিন্তু দাগ থাকে। কিন্তু এই সামান্য আমিত্ব মুক্ত পুরুষকে আবদ্ধ করতে পারে না।

৪। যেমন পায়ে জুতা পরা থাকলে লোকে স্বচ্ছন্দে কাঁটার ওপর দিয়ে চলে যায়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানরূপ আবরণ পরে এই কণ্টকময় সংসারে বিচরণ করতে পারে।

৫। যতক্ষণ সেথা সেথা (অর্থাৎ বাহিরে), ততক্ষণ অজ্ঞান; যখন হেথা হেথা (অন্তরের দিকে), তখন জ্ঞান। যার হেথায় আছে (অর্থাৎ অন্তরে ভাব আছে), তার সেথায়ও আছে (অর্থাৎ ভগবৎপদে স্থান আছে)।

সিদ্ধ অবস্থা

১। লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোনা হয়, তাকে মাটীর ভেতর চাপা রাখ আর আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখ, সে সোনাই থাকে। যিনি সচ্চিদানন্দ লাভ করেছেন, তাঁর অবস্থাও সেই রকম। তিনি সংসারেই থাকুন আর বনেই থাকুন, তাতে তাঁর দোষ-স্পর্শ হয় না।

২। যেমন লোহার তলোয়ার স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তলোয়ার হয়, আকার প্রকার সেই রকমই থাকে কিন্তু তাতে আর হিংসার

কাজ চলে না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করলে তার দ্বারা আর কোন অন্যায় কাজ হয় না।

৩। কোন ব্যক্তি পরমহংসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন—সিদ্ধ-পুরুষ হলে কিরূপ অবস্থা হয়?

উত্তরে তিনি বললেন—যেমন আলু বেগুন সিদ্ধ হলে নরম হয়, তেমনি সিদ্ধপুরুষের স্বভাব নরম হয়ে থাকে। তাঁর সব অভিমান চলে যায়।

৪। যে যেরূপ ভাবনা করে থাকে, তার সিদ্ধিও সেই রকমই হয়ে থাকে। যেমন দৃষ্টান্ততে বলে, আরসোলা কাঁচপোকাকে ভেবে ভেবে কাঁচপোকা হয়ে যায়, তেমনি যে সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করে সেও আনন্দময় হয়ে যায়।

৫। অহঙ্কার কি রকম জান? যেমন পদ্মের পাঁপড়ি ও নারকেল-সুপারির বালতো খসে গেলেও সেস্থানে একটা দাগ থাকে, তেমনি অহঙ্কার গেলেও তাতে একটু দাগের চিহ্ন থাকেই থাকে। তবে সে অহঙ্কারে কারও কিছু অনিষ্ট করতে পারে না। তার দ্বারা খাওয়া-দাওয়া, শোয়া ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন কর্ম চলে না।

৬। যতদিন শুধু ধান থাকে, পুঁতে দিলেই গাছ হয়। কিন্তু সেই ধানকে সিদ্ধ করে পুঁতলে আর গাছ হয় না; তেমনি যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের আর এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

৭। যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছেন, অর্থাৎ যাঁর ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়েছে, তাঁর দ্বারা আর কোনরূপ অন্যায় কার্য হতে পারে না; যেমন, যে নাচতে জানে তার পা কখনো বেতালে পড়ে না।

৮। বৃহস্পতির পুত্র কচের সমাধিভঙ্গের পর যখন মন বহির্জগতে নেমে আসছিল, তখন ঋষিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এখন

তোমার কিরূপ অনুভূতি হচ্ছে?" তাতে তিনি বলেছিলেন, "সর্বং ব্রহ্মময়ং—তিনি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

সর্বধর্ম-সমন্বয়

১। ছাতের ওপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়।

২। ঈশ্বর এক; তাঁর অনন্ত নাম, অনন্ত ভাব! যার যে নামে, যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে, সেই ভাবে ডাকলে দেখা পায়।

৩। যত মত তত পথ। যেমন এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

৪। যেমন জল এক পদার্থ—দেশ, কাল, পাত্র ভেদে তার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। বাঙ্গলা দেশে জল বলে, হিন্দিতে পানি বলে, ইংরেজীতে ওয়াটার বা একোয়া বলে। পরস্পরের ভাষা না জানা থাকলে কারুর কথা কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু জানলে আর ভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না।*

---

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' হইতে সংগৃহীত।